كشف الشبهات

« باللغة البنغالية »

الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

ترجمة: عبد المتين عبد الرحمن السلفي

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2012 - 1433

IslamHouse.com

প্রথম অধ্যায়

রাসূলগণের প্রথম দায়িত্ব:

ইবাদতে আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতিষ্ঠা

প্রথমেই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, তাওহীদের অর্থ ইবাদতকে পাক পবিত্র আল্লাহর জন্যই একক ভাবে সুনির্দিষ্ট করা। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণের দ্বীন। যে দ্বীনসহ আল্লাহ তাঁদেরকে প্রেরণ করেছিলেন। সেই রাসূল-গণের প্রথম হচ্ছেন নূহ 'আলাইহিস্ সালাম। আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর কাওমের নিকট সেই সময় পাঠালেন যখন তারা ওয়াদ্দ, সুওয়া', ইয়াগুস, ইয়া'উক ও নাস্‌র নামীর কতিপয় সৎ লোকের ব্যাপারে অতি মাত্রায় বাড়াবাড়ি করে চলেছিল। আর সর্ব শেষ রাসূল হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, যিনি ঐ সব নেক লোকদের মুর্তি ভেঙ্গে চুর্ণ বিচূর্ণ করেন। আল্লাহ তাঁকে এমন সব লোকের মধ্যে পাঠান যারা ইবাদত করত, হজ্জ করত, দান খয়রাত করত এবং আল্লাহকেও অধিক মাত্রায় স্মরণ করত। কিন্তু তারা কোনো কোনো সৃষ্ট ব্যক্তি ও বস্তুকে আল্লাহ্ এবং তাদের মাঝে মাধ্যম রূপে দাঁড় করাত। তারা বলত, তাদের মধ্যস্থতায় আমরা আল্লাহর নৈকট্য কামনা করি, আর আল্লাহর নিকট (আমাদের জন্য) তাদের সুপারিশ

কামনা করি। তাদের এই নির্বাচিত মাধ্যমগুলো হচ্ছে: ফেরেশতা, ঈসা, মারইয়াম এবং মানুষের মধ্যে যাঁরা সৎকর্মশীল- আল্লাহ্র সালেহ বান্দা। অবস্থার এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ প্রেরণ করলেন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের পূর্ব পুরুষ ইব্রাহীম আলাহিস্ সালাম এর দ্বীনকে তাদের জন্য নব প্রাণ শক্তিতে উজ্জীবিত করার জন্য। তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের এই পথ এবং এই প্রত্যয় একমাত্র আল্লাহরই হক। এর কোনোটিই আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য কোনো ফেরেশতা এবং কোনো প্রেরিত রাসূলের জন্যও সিদ্ধ নয়। অপরাপর লোকেরা তো পরের কথা !

তা ছাড়া ঐ সব মুশরিকগণ সাক্ষ্য দিত যে, আল্লাহই একামাত্র সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিতে তাঁর কোনো শরীক নেই। বস্তুত: তিনিই একমাত্র রেযেকদাতা, তিনি ছাড়া রেযেক দেওয়ার আর কেউ নেই। জীবনদাতাও একমাত্র তিনিই, আর কেউ মৃত্যু দিতে পারে না। বিশ্ব জগতের একমাত্র পরিচালকও তিনিই, আর কারোরই পরিচালনার ক্ষমতা নেই। সপ্ত আকাশ ও যা কিছু তাদের মধ্যে বিরাজমান এবং সপ্ত তবক যমীন ও যা কিছু তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে সব কিছু তাঁরই অনুগত দাসানুদাস, সবই তাঁর ব্যবস্থাধীন এবং সব কিছুই তাঁরই প্রতাপে এবং তাঁরই আয়ত্তাধীনে নিয়ন্ত্রিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাসূল যাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন তারা তাওহীদু রবুবিয়াতের স্বীকৃতি দিত এর প্রমাণাদির বর্ণনা

[রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব মুশ্‌রিকের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তারা তাওহীদে রবুবিয়াত অর্থাৎ আল্লাহ যে মানুষের রব, প্রতিপালক ও প্রভু একথা স্বীকার করত কিন্তু এই স্বীকৃতি ইবাদতে শির্ক এর পর্যায় থেকে তাদেরকে বের করে আনতে পারে নি— আলোচ্য অধ্যায়ে তারই বিশদ বিবরণ রয়েছে]

যে সব কাফেরের সঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ করেছেন তারা তাওহীদে রবুরিয়তের সাক্ষ্য প্রদান করত—এই কথার প্রমাণ যদি তুমি চাও তবে নিম্ন লিখিত আল্লাহ্‌র বাণী পাঠ কর:

﴿ قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ فَقُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١ ﴾ [يونس: ٣١]

“বলুন, ‘কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, জীবিতকে মৃত থেকে কে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত হতে কে বের করেন এবং সব বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করেন?’ তখন তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ্। সুতরাং বলুন, ‘তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?’ (সূরা ইউনুস : ৩১)

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন :

﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝٨٤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝٨٥ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۝٨٦ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝٨٧ قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ۝٨٩ ﴾ [المؤمنون: ٨٤، ٨٩]

“বলুন, ‘যমীন এবং এতে যা কিছু আছে এগুলো(র মালিকানা) কার? যদি তোমরা জান (তবে বল)। অবশ্যই তারা বলবে, ‘আল্লাহ্র।’ বলুন, ‘তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?’ বলুন, ‘সাত আসমান ও মহা-‘আরশের রব কে?’ অবশ্যই তারা বলবে, ‘আল্লাহ্। বলুন, ‘তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না? বলুন, ‘কার হাতে সমস্ত বস্তুর কর্তৃত্ব? যিনি আশ্রয় প্রদান করেন

অথচ তাঁর বিপক্ষে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না , যদি তোমরা জান (তবে বল)। অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ্।' বলুন, 'তাহলে কোথা থেকে তোমরা জাদুকৃত হচ্ছো? (সূরা মু'মেনুন : ৮৪-৮৯)। অনুরূপ আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

যখন এ সত্য স্বীকৃত হলো যে, তারা আল্লাহর রবুবিয়াতের গুণাবলীর স্বীকৃতি দিত, অথচ তাদের সেই ঈমান তাদেরকে সেই তাওহীদে প্রবেশ করায় নি -যার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। আর তুমি এটাও অবগত হলে যে, যে তাওহীদকে তারা অস্বীকার করেছিল সেটা ছিল তাওহীদে ইবাদত (ইবাদতে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করা)— আমাদের যুগের মুশরিকগণ যাকে 'ই'তেকাদ" বলে থাকে। তাদের[1] ঐ "ই'তেকাদের" নমুনা ছিল এই যে, তারা আল্লাহকে দিবানিশি আহবান করত, আর তাদের অনেকেই আবার ফেরেশতাদেরকে এজন্য আহবান করত যে, ফেরেশতাগণ তাদের সৎ স্বভাব ও আল্লাহর নৈকট্যে অবস্থান হেতু তাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করবে; অথবা তারা কোন পূণ্য স্মৃতি ব্যক্তি বা নবীকে ডাকতো যেমন 'লাত' বা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম।

---

[1] রাসূলের যুগের আরবের মুশরিকদের।

আর এটাও তুমি জানতে পারলে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে এই প্রকার শির্কের জন্য যুদ্ধ করেছেন এবং তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন যেন তারা একমাত্র আল্লাহর জন্যই তাদের ইবাদতকে খালেস (নির্ভেজাল) করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন :

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ ﴾ [الجن: ١٨]

"আরও (এই অহী করা হয়েছে) যে, মসজিদগুলো সমস্তই আল্লাহ্‌র (যিকরের) জন্য, অতএব তোমরা আহ্বান করতে থাকবে একমাত্র আল্লাহ্‌কে এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে আর কাওকেও ডাকবে না।" (সুরা জিন :১৮)

এবং তিনি একথাও বলেছেন:

﴿ لَهُۥ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ ﴾ [الرعد: ١٤]

"সমস্ত সত্য আহবান একমাত্র তাঁরই জন্য, বস্তুত: তাঁকে ছেড়ে অন্য যাদেরকেই তারা আহ্বান করে, তারা তাদের সে আহ্বানে কিছুমাত্রও সাড়া দিতে পারে না।" (সূরা রা'আদ :১৪)

এটাও বাস্তব সত্য যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে এই জন্যই যুদ্ধ করেছেন যেন তাদের যাবতীয় প্রার্থনা আল্লাহর কাছেই হয়ে যায়; যাবতীয় কুরবানীও আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হয়, যাবতীয় নযর নেয়াযও আল্লাহর জন্যই উৎসৃষ্ট হয়; সমস্ত আশ্রয় প্রার্থনা আল্লাহর সমীপেই করা হয় এবং সর্ব প্রকার ইবাদত আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হয়।

এবং তুমি এটাও অবগত হলে যে, তাওহীদে রবুবিয়ত সম্বন্ধে তাদের স্বীকৃতি তাদেরকে ইসলামের মধ্যে দাখেল করে দেয় নি এবং ফেরেশতা, নবী ও ওলীগণের সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে সুপারিশ লাভের ইচ্ছা ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের বাসনা এমন মারাত্মক অপরাধ, যা তাদের জান-মালকে মুসলিমদের জন্য হালাল করে দিয়েছিল।

এখন তুমি অবশ্য বুঝতে পারছ যে, আল্লাহর রাসূলগণ কোন তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দিয়েছিলেন ও মুশরিকগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর প্রকৃত তাৎপর্যই হচ্ছে তাওহীদুল ইবাদাহ বা ইবাদতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা

[লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে তাওহীদে ইবাদত। বর্তমান যুগে ইসলামের দাবীদারগণের তুলনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সময়ের কাফেরগণ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর অর্থ বেশী ভাল জানতো। বক্ষমাণ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হচ্ছে।]

কালেমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ ও তাৎপর্য বলতে যা বুঝায় তাই হচেছ তাওহীদে ইবাদত। আর বর্তমান যুগে ইসলামের দাবীদারগণের তুলনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সময়ের কাফেরগণ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর অর্থ বেশী ভাল জানতো। আর যখন তুমি বল, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বা আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তখন এ তাওহীদই তোমার কথার উদ্দেশ্য। কেননা, তাদের[2] নিকট ‘ইলাহ’ হচ্ছেন সেই সত্তা যাকে এ সকল কাজে (বিপদাপদ, নযর নিয়ায, যবেহ,

[2] রাসূলের যুগের আরবের মুশরিকদের নিকট।

আশ্রয় ইত্যাদিতে) উদ্দেশ্য নেয়া হয়। চাই তা ফেরেশতা, নবী, ওলী, বৃক্ষ, কবর, জিন যা-ই হোক না কেন[3]। তখনকার কাফেরগণ এ (কালেমা দ্বারা) কখনও এটা উদ্দেশ্য নিত না যে, ইলাহ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, আহার দাতা, সব কিছুর ব্যাবস্থাপক বা পরিচালক। কেননা কাফেররা এটা জানত এবং স্বীকার করত যে, এই সব গুণাবলী অর্থাৎ সৃষ্টি করা, আহার দান এবং ব্যবস্থাপনা একমাত্র একক আল্লাহর জন্যই সুনির্দিষ্ট, আর কারোরই তা করবার ক্ষমতা নেই (এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি)। বরং আরবের তৎকালীন[4] মুশরিকরা "ইলাহ" এর সেই অর্থই বুঝত যা আজ কালের মুশরিকগণ "সাইয়েদ" "মুর্শিদ" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বুঝে থাকে। এ ধরণের বিশ্বাসের সময়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকটে কালেমায়ে তাওহীদের আহ্বান নিয়ে আগমন করেছিলেন, সেটা হচ্ছে "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ"। আর এই কালেমার অর্থই হচ্ছে এর আসল উদ্দেশ্য, শুধুমাত্র এর শব্দগুলি উদ্দেশ্য নয়।

---

[3] অর্থাৎ ফেরেশতা, নবী, ওলী, বৃক্ষ, কবর, জিন যাদেরকেই ঐ সকল কাজে আহ্বান জানানো হয়, তারাই 'ইলাহ' হিসেবে স্বীকৃত হয়ে যাবে। এটা রাসূলের সময়কার আরবের মুশরিকরা ভালোভাবেই জানত।

[4] রাসূলের যুগের।

রাসূলের সময়ের অজ্ঞ কাফেররাও এ কথা জানত যে, এই কালেমা থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্য ছিল: যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরী করা। (কোনো সৃষ্টজীবের ইবাদত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা) তাঁকে ছেড়ে আর যাকে বা যে বস্তুকে উপাসনা করা হয় তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা এবং তা থেকে বিমুক্ত থাকা। কেননা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা বল: “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ”— ‘আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো হক্ক মা‘বুদ নেই’, তখন তারা বলে উঠল,

﴿ أَجَعَلَ ٱلۡأٓلِهَةَ إِلَٰهٗا وَٰحِدًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عُجَابٞ ۝٥ ﴾ [ص: ٥]

“এই লোকটি কি বহু উপাস্যকে এক উপাস্যে পরিণত করছে? এ তো ভারী এক আশচর্য্য ব্যাপার !” (সূরা সাদ : ৫)

যখন তুমি জানতে পারলে যে, অজ্ঞ-মূর্খ কাফেরগণও কালেমার অর্থ বুঝে নিয়েছিল, তখন এটা কত বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অজ্ঞ-মূর্খ কাফেরগণও কালেমার যে অর্থ বুঝতে পেরেছিল, ইসলামের (বর্তমান) দাবীদারগণ তাও বুঝে উঠতে সক্ষম হচ্ছে না ! বরং এরা মনে করছে কালেমার আক্ষরিক উচ্চারণই যথেষ্ট,

তার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে অন্তর দিয়ে প্রত্যয় পোষণ করার প্রয়োজন নেই।

বর্তমানকালের মুসলিম নামধারীদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান (বুদ্ধিজীবী কিংবা দার্শনিক) বলে পরিচিত, তারা এ কালেমার অর্থ করে থাকে যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই, কোনো রুযীদাতা নেই এবং একমাত্র তিনিই সব কিছুর পরিচালক, তিনিই সব বিষয়ের ব্যবস্থাপক। (অথচ এ অর্থটি এ কালেমার সঠিক অর্থ নয়) তাহলে এটা সাব্যস্ত হচ্ছে যে এমন মুসলিম নামধারী লোকের মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই যার চেয়ে (তৎকালীন আরবের) অজ্ঞ-মূর্খ কাফেরও কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র এর অর্থ বেশী জানত।

চতুর্থ অধ্যায়

তাওহীদের জ্ঞানলাভ আল্লাহর এক বিরাট নে'আমত

[একজন মুমিনের এটা জানা যে, তাওহীদ সম্পর্কে মু'মিনের জ্ঞান লাভ তার প্রতি আল্লাহর এমন এক নে'আমত যে জন্য আনন্দ প্রকাশ করা এবং এটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয় থাকা তার অবশ্য কর্তব্য]

যা বর্ণিত হয়েছে (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ হচ্ছে, ইবাদতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা), যখন তুমি মন থেকে তা বুঝতে সক্ষম হলে।

আরও বুঝতে পারলে আল্লাহর সাথে (কিভাবে) শির্ক (হয় সেটা) সম্পর্কে, যে শির্ক (এর পরিণতি) সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ ﴾ [النساء: ٤٨، 116]

"নিশ্চয় আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরীক করার যে পাপ তা তিনি ক্ষমা করেন না, এ ছাড়া অন্য যে কোন পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন।" (সূরা নেসা : ৪৮, ১১৬)

আর সে দ্বীনকেও জানতে পারলে, যে দ্বীন নিয়ে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত রাসূলগণকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন এবং যে দ্বীন ছাড়া আল্লাহ অন্য কোন দ্বীনই কবুল করবেন না।

তাছাড়া অধিকাংশ মানুষের মধ্যে যেভাবে অজ্ঞতা-মূর্খতা ছেয়ে গেছে তাও সম্যক জানতে ও বুঝতে পারলে, তখন তুমি দু'টি উপকার লাভ করবে,

এক: আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমতের উপর খুশি হবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨ ﴾ [يونس: ٥٨]

"বল ! আল্লাহ এই যে ইন'আম এবং তাঁর এই যে রহমত (তোমরা পেয়েছ) এর জন্য সকলের উৎফুল্ল হওয়া উচিত, তারা যা পুঞ্জীভূত করে তা অপেক্ষা তা কতই না উত্তম।" (সূরা ইউনুস : ৫৮)

দুই : আর তোমার মধ্যে (তা) ভীষণ ভয়েরও উদ্রেক করবে। কারণ, যখন তুমি বুঝতে পারলে যে, মানুষ তার মুখ থেকে বের হওয়া কোনো একটি কথার জন্য কুফরি করে ফেলতে পারে।

এমন কি যদিও সে উক্ত কথাটি অজ্ঞতা বশত বলে ফেলে তবুও; আর তার অজ্ঞতা ওযর হিসেবে বিবেচিত হবে না[5]। অথবা হতে পারে সে এ কথাটি বলেছে এমতাবস্থায় যে সে মনে করেছে যে এটা তাকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য এনে দেবে, যেমন মুশরিকরা মনে করত; (কিন্তু সেটাও তাকে কুফরিতে নিপতিত করতে পারে)। বিশেষত: যখন কুরআনে বর্ণিত মুসা 'আলাইহিস সালামের ঘটনাটি আল্লাহ তা'আলা তোমার মনে উদয় করিয়ে দিবেন, যে ঘটনায় মূসার কওম সৎ ও জ্ঞানী গুণী হওয়া সত্ত্বেও বলেছিল :

﴿ٱجۡعَل لَّنَآ إِلَٰهٗا كَمَا لَهُمۡ ءَالِهَةٞۚ﴾ [الاعراف: ١٣٨]

"আমাদের জন্যও একটি উপাস্য (মূর্তি) স্থির করে দিন, যেমন তাদের জন্য রয়েছে বহু উপাস্য মুর্তি !" (সূরা আ'রাফ : ১৩৮)। যখন এ ঘটনাটি উপলব্ধি করতে পারবে, তখন (কুফর, শির্কের) ভয় তোমার কাছে বৃহৎ হয়ে দেখা দিবে এবং এ জাতীয় বিষয়

---

[5] সঙ্গত কোনো কারণ ছাড়া অজ্ঞতা ওজর হিসেবে বিবেচিত হবে না। সঙ্গত কারণের মধ্যে রয়েছে, লোকালয়ে না থাকা, যেখানে কেউ তাকে এ ব্যাপারে সাবধান করার নেই সেখানে অবস্থান করা, দেশে মূর্খতা ছেয়ে যাওয়া। কিন্তু জানা-শুনার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যদি অজ্ঞতার দোহাই দেওয়া হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। ব্যাপারটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি হিসেবে ভিন্ন হতে বাধ্য। [সম্পাদক]

(কুফর, শির্ক) ও অনুরূপ বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য জন্য তোমার আগ্রহ বেড়ে যাবে।

পঞ্চম অধ্যায়

নবী ও ওলীদের সাথে মানুষ ও জিনদের শত্রুতা :

আল্লাহর হিকমতের চাহিদা হচ্ছে যে তিনি তাঁর নবী ও ওলীদের বিপক্ষে মানুষ ও জিন শত্রুদেরকে ক্রিয়াশীল রাখেন

জেনে রাখ, পাক-পবিত্র আল্লাহর অন্যতম হিকমত এই যে, তিনি এই তাওহীদের নিশান বরদাররূপে এমন কোনো নবী প্রেরণ করেন নি যাঁর পিছনে দুশমন দাঁড় করিয়ে দেন নি। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّٗا شَيَٰطِينَ ٱلۡإِنسِ وَٱلۡجِنِّ يُوحِي بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ زُخۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗاۚ ﴾ [الانعام: ١١٢]

“আর এভাবেই আমরা মানব ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তারা একে অপরকে চমকপ্রদ বাক্যের কুমন্ত্রণা দেয়।” (সূরা আন‘আম : ১১২)

আবার কখনও তাওহীদের শত্রুদের নিকটে থাকে অনেক বিদ্যা, বহু, কেতাব ও বহু যুক্তি প্রমাণ। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

﴿ فَلَمَّا جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ﴾ [غافر: ٨٣]

“অতঃপর যখন তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল তাদের কাছে, তখন তারা নিজেদের (পৈতৃক) বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়েই উৎফুল্ল হয়ে রইল।” (সুরা গাফের: ৮৩)

ষষ্ঠ অধ্যায়

কিতাব ও সুন্নাহর অস্ত্রসজ্জা

[শত্রু পক্ষের সৃষ্ট সন্দেহাদি নিরসনে কুরআন ও সুন্নাহর অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত (জ্ঞানে জ্ঞানী) থাকতে হবে।]

যখন তুমি এটা (নবী ও ওলীদের পিছনে দুশমন দল নিয়োজিত রয়েছে) জানতে পারলে, আর এ কথাও জানতে পারলে যে, আল্লাহর পথের মোড়ে উপবিষ্ট দুশমনগণ হয়ে থাকে কথাশিল্পী, বিদ্যাধর এবং যুক্তিবাগীশ, তখন তোমার জন্য অবশ্য কর্তব্য হবে আল্লাহর দ্বীন থেকে সেই সব বিষয় শিক্ষা করা যা তোমার জন্য হয়ে উঠবে এমন এক কার্যকর অস্ত্র যে অস্ত্র দ্বারা তুমি ঐ শয়তানদের মুকাবেলা এবং সংগ্রাম করতে সক্ষম হবে, যাদের অগ্রদূত ও তাদের পূর্বসূরী তোমার মহান ও মহীয়ান প্রভু পরওয়ারদেগারকে বলেছিল :

﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝١٦ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ ۝١٧﴾ [الاعراف: ١٦، ١٧]

“নিশ্চয় আমি তোমার সরল সুদৃঢ় পথের উপর গিয়ে বসব, অতঃপর আমি তাদের নিকট গিয়ে উপনীত হব তাদের সম্মুখের দিক থেকে ও তাদের পশ্চাতের দিক থেকে এবং তাদের দক্ষিণের দিক থেকে ও তাদের বামের দিক থেকে। আর তাদের অধিকাংশকে আপনি কৃতজ্ঞ পাবেন না।” (সুরা আ‘রাফ :১৬-১৭)

কিন্তু যখন তুমি আল্লাহর পানে অগ্রসর হবে ও আল্লাহর দীল প্রমাণাদির প্রতি তোমার হৃদয়-মন ও চোখ-কানকে ঝুঁকিয়ে দেবে, তখন তুমি হয়ে উঠবে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত। কারণ তখন তুমি তোমার জ্ঞান ও যুক্তি প্রমাণের মুকাবেলায় শয়তানকে দুর্বল দেখতে পাবে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦﴾ [النساء: ٧٦]

“নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত ও কুট-কৌশল হচ্ছে অতি দুর্বল।” (সূরা নেসা :৭৬)

একজন সাধারণ মুওয়াহ্হিদ (একত্ববাদী) ব্যক্তি হাজার মুশরিক পণ্ডিতের উপর জয় লাভের সামর্থ রাখে। কুরআন বজ্রগম্ভীর ভাষায় ঘোষণা করছে:

﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ١٧٣ ﴾ [الصافات: ١٧٣]

“আর আমাদের যে ফওজ, নিশ্চয় বিজয়ী হবে তারাই।” (সুরা সাফফাত : ১৭৩)

আল্লাহর ফওজগণ যুক্তি ও কথার বলে জয়ী হয়ে থাকেন, যেমন তারা জয়ী হয়ে থাকেন তলওয়ার ও অস্ত্র বলে। ভয় ঐসব মুওয়াহ্হিদদের জন্য যাঁরা বিনা অস্ত্রে পথ চলেন। অথচ আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এমন এক কেতাব দ্বারা অনুগৃহীত করেছেন যার ভিতর তিনি প্রত্যেক বিষয়ের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন এবং যে কেতাবটি হচ্ছে “স্পষ্ট ব্যাখ্যা যা পথ-নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদের জন্য।” ফলে বাতেলপন্থীগণ যে কোনো দলীল নিয়েই আসুক না কেন তার খন্ডন এবং তার অসারতা প্রতিপাদন করার মত যুক্তি প্রমান খোদ কুরআনেই বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

﴿ وَلَا يَأۡتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ وَأَحۡسَنَ تَفۡسِيرًا ٣٣ ﴾ [الفرقان: ٣٣]

“আর যে কোন প্রশ্নই তারা তোমার নিকট নিয়ে আসে (সে সম্বন্ধে ওহীর মাধ্যমে) আমি সত্য ব্যাপার এবং (তার) সুসঙ্গত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আপনাকে জানিয়ে দেই।” (সূরা ফুরকান : ৩৩)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কতিপয় মুফাস্‌সির বলেছেন : “কিয়ামত পর্যন্ত বাতিলপন্থীগণ যে যুক্তিই উপস্থাপিত করুক, এই আয়াত মাসগ্রিক ভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, কুরআন পাক তা খণ্ডনের শক্তি রাখে।”

সপ্তম অধ্যায়

বাতিলপন্থীদের দাবীসমূহের খন্ডন—

সংক্ষিপ্তাকারে ও বিস্তারিতভাবে

আমাদের সমসাময়িক যুগের মুশরিকগণ আমাদের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তিতর্কের অবতারণা করে থাকে আমি তার প্রত্যেকটির জওয়াবে সেই সব কথাই বলব যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

বাতেলপন্থীদের কথার জওয়াব আমরা দুই পদ্ধতিতে প্রদান করব : ১ সংক্ষিপ্তাকারে, ২.তাদের দাবীসমূহ বিশ্লেষণ করে বিশদভাবে।

১. সংক্ষিপ্ত জওয়াব

সংক্ষিপ্ত হলেও এটা হবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত কল্যাণবহ সেই সব ব্যক্তির জন্য যাদের প্রকৃত বোধ শক্তি আছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী,

﴿ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ

ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأۡوِيلِهِۦۖ وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٧﴾ [آل عمران: ٧]

"তিনিই তো সেই সত্ত্বা, যিনি আপনার প্রতি নাযিল করেছেন এই কিতাব; যার কতক আয়াত হচ্ছে মুহকাম– স্পষ্ট অর্থবহ, সে গুলি হচ্ছে কেতাবের মুলাধার; আর কতকগুলি হচ্ছে মোতাশাবেহ– অস্পষ্ট অর্থসম্পন্ন, ফলে যাদের অন্তরে আছে বক্রতা তারা অনুসরণ করে থাকে তার মধ্য হ'তে মোতাশাবেহ– অস্পষ্ট অর্থসম্পন্ন আয়াতগুলির, ফিৎনা সৃষ্টির মতলবে এবং (অসঙ্গত) তাৎপর্য্য বের করার উদ্দেশ্যে, অথচ এর প্রকৃত তাৎপর্য কেউই জানে না আল্লাহ্ ব্যতীত।" (সূরা আলে ইমরান :৭)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতেও এটা সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন:

«فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ»

"যখন তুমি ঐ সমস্ত লোকদের দেখবে যারা দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট আয়াতগুলির অনুসরণ করছে তখন বুঝে নেবে এরা সেই সব লোক যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন, সুতরাং তোমরা ঐসব

লোকদের ব্যাপারে হুশিয়ার থাক।” (বুখারী: ৪৫৪৭ ও মুসলিম: ২৬৬৫)

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে মুশরেকদের মধ্যে কতক লোক বলে থাকে :

﴿ أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢ ﴾ [يونس: ٦٢]

“দেখ ! নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধু তারা, যাদের ভয়-ভীতির কোনই আশঙ্কা নেই এবং কখনো চিন্তাগ্রস্তও হবে না তারা।” (সূরা ইউনুস : ৬২)

তারা আরও বলে: নিশ্চয় সুপারিশের ব্যাপারটি অবশ্যই সত্য। অথবা বলে: আল্লাহর নিকটে নবীদের একটা বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কিংবা নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এমন কিছু কথায় তারা উল্লেখ করবে, যা থেকে তারা তাদের বাতিল বক্তব্যের পক্ষে দলীল পেশ করতে চাইবে, অথচ তুমি বুঝতেই পারবে না যে, যে কথার তারা অবতারণা করেছে তার অর্থ কি ?

এরূপ ক্ষেত্রে তার জবাব এই ভাবে দিবে :

আল্লাহ তাঁর কেতাবে উল্লেখ করেছেন : “যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা মুহকাম (স্পষ্ট অর্থবোধক) আয়াতগুলো বর্জন করে থাকে, আর মুতাশাবেহ্ (অস্পষ্ট অর্থবোধক) আয়াতের পিছনে ধাবিত হয়।” আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: ‘মুশরিকগণ আল্লাহর রবুবিয়াতের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে, তবু আল্লাহ তাদেরকে কাফেররূপে অভিহিত করেছেন এজন্যই যে, তারা ফেরেশতা, নবী ও ওলীদের সঙ্গে ভ্রান্ত সম্পর্ক স্থাপন করে বলে থাকে :

﴿هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ﴾ [يونس: ١٨]

“এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।” (সূরা ইউনুস : ১৮ আয়াত)

এটি একটি মুহকাম আয়াত, যার অর্থ পরিষ্কার। এর অর্থ বিকৃত করার সাধ্য কারোরই নেই।

আর হে মুশরিক! তুমি কুরআন অথবা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী থেকে যা আমার নিকট পেশ করলে তার অর্থ আমি বুঝি না, তবে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহর কালামের মধ্যে কোন পরস্পর-বিরোধী কথা নেই, আর আল্লাহর নবী

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কথাও আল্লাহর কালামের বিরোধী হতে পারে না।

এই জবাবটি অতি উত্তম ও সর্বতোভাবে সঠিক। কিন্তু আল্লাহ যাকে তাওফীক দেন সে ছাড়া আর কেউ এটি উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। এই জওয়াবটি তুমি তুচ্ছ মনে করো না, দেখ! আল্লাহ স্বয়ং এরশাদ করেন :

﴿ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٖ ﴿٣٥﴾ ﴾ [فصلت: ٣٥]

“বস্তুত: যারা ধৈর্য ধারণে অভ্যস্ত তারা ব্যতীত আর কেউই এই মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না, অধিকন্তু মহা ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কেউই এটা লাভে সমর্থ হয় না”। (সূরা হা’মীম আস-সাজদা: ৩৫)

২. বিস্তারিত জওয়াব

সত্য দ্বীন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য আল্লাহর দুশমনগণ নবী রাসূলদের প্রচারিত শিক্ষার বিরুদ্ধে যে সব ওযর আপত্তি ও বক্তব্য পেশ করে থাকে তার মধ্যে একটি এই যে, তারা বলে থাকে:

“আমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করি না বরং আমরা সাক্ষ্য দিয়ে থাকি যে, কেউই সৃষ্টি করতে, রুযী দিতে, উপকার এবং অপকার সাধন করতে পারে না একমাত্র একক এবং লা-শরীক আল্লাহ ছাড়া— আর (আমরা এ সাক্ষ্যও দিয়ে থাকি যে,) স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘আলায়হি ওয়া সাল্লামও নিজের কোনো কল্যাণ এবং অকল্যাণ সাধন করতে সক্ষম নন। আবদুল কাদের জিলানী ও অন্যান্যরা তো বহু দুরের কথা। কিন্তু একটি কথা এই যে, আমি একজন গুনাহগার ব্যক্তি, আর যারা আল্লাহর নেককার বান্দা তাদের রয়েছে আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদা, তাই তাঁদের মধ্যস্থতায় আমি আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর করুণা প্রার্থী হয়ে থাকি।

যখন তারা এ ধরনের কথা বলে, তখন তার উত্তর তা দিয়ে প্রদান করবে যা পূর্বে গত হয়েছে, আর তা হচ্ছে এই :

যাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ‘সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ করেছেন তারাও তুমি যে কথার উল্লেখ করলে তা স্বীকার করত, আর এ কথাও তারা স্বীকার করত যে, প্রতিমাগুলো কোনো কিছুই পরিচালনা করে না। তারা তো কেবল তাদের নিকট মর্যাদা (র দোহাই) ও শাফা‘আতই কামনা করত। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর

কিতাবে যা উল্লেখ করেছেন এবং বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন সে সব তাদের পড়ে শুনিয়ে দাও।

এখানে সন্দেহকারী যদি (এই কুটতর্কের অবতারণা করে আর) বলে যে, এই সব আয়াত তো মূর্তিপুজকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, তবে তোমরা কি ভাবে সৎ ব্যক্তিদেরকে ঠাকুর বিগ্রহের সমতুল্য করে নিচ্ছ অথবা নবীগণকে কি ভাবে ঠাকুর বিগ্রহের শামিল করছ? তখন তুমি আগে যা চলে গেছে তা দিয়েই এর জবাব দিবে[6]।

কেননা, যখন সে স্বীকার করছে যে, (রাসূলের যুগের) কাফেরগণও আল্লাহর সার্বভৌম রবূবিয়তের সাক্ষ্য প্রদান করত; আর তারা যাদেরকে (নযর নিয়ায প্রভৃতি পেশ অথবা পূজা অর্চনা ইত্যাদি দ্বারা) উদ্দেশ্য করত, তারা তো তাদের থেকে কেবল সুপারিশই চাইত। কিন্তু যদি সে তার কাজ ও পূর্ববর্তী কাফের লোকদের কাজের মধ্যে যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে[7] তা দিয়ে পার্থক্য

---

[6] অর্থাৎ পূর্বেকার মুশরিকরাও আল্লাহর রবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি দিত এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তারা মুশরিক হয়েছিল, কারণ তারা মাধ্যম গ্রহণ করেছিল। তবে এটা সত্য যে তারা সত্যিকার অর্থে রুবুবিয়্যাতের হক আদায় করত না। কারণ, রুবুবিয়্যাতের হক আদায় করলে ইবাদত একমত্র আল্লাহরই করত। [মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আলে আশ-শাইখ, শারহু কাশফিশ শুবহাত, পৃ. ৬২]

[7] অর্থাৎ পূর্বেকার মুশরিকরা তো মূর্তিপূজা করত, সে তো আর মূর্তিপূজা করছে না। [মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আলে আশ-শাইখ, শারহু কাশফিশ শুবহাত, পৃ. ৬২]

করার চেষ্টা করে, তা হলে তাকে বলে দাও : কাফেরগণের মধ্যে কতক তো প্রতিমা পূজা করত, কিন্তু আবার কতক তো এমন ছিল যারা ঐ সব আওলিয়াদের আহ্বান করত[৪] যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন:

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ﴾ [الاسراء: ٥٧]

"এই মুশরিকরা যাদেরকে আহ্বান করে থাকে, তারা (সে সব সৎ লোকেরা) তো নিজেরাই এজন্য তাঁর (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের অবলম্বন খুঁজে বেড়ায় যে, কোন্‌টি নিকটতর?" (সূরা ইসরা : ৫৭)।

আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈসা ইবন মারইয়াম ও তাঁর মাকে আহ্বান করত। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ مَّا ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ إِلَّا رَسُولٞ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٞۖ كَانَا يَأۡكُلَانِ ٱلطَّعَامَۗ ٱنظُرۡ كَيۡفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ ثُمَّ ٱنظُرۡ أَنَّىٰ

[৪] অর্থাৎ এটা বলে দাও যে, পূর্ববর্তী কাফের, মুশরিকরা যে শুধু মূর্তিপূজা করত, তা কিন্তু নয়, বরং তারা নেককার বান্দা ও নবী-রাসূলদেরও পূজা করত। পরবর্তী বাক্যে এর প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। [সম্পাদক]

يُؤْفَكُونَ ۝ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًاۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۝﴾ [المائدة: ٧٥، ٧٦]

"মারইয়ামের পুত্র মসীহ একজন রাসূল ছাড়া তো আর কিছুই নয়, তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন, আর মসীহের মাতা ছিল একজন সত্যসন্ধ নারী ; তাঁরা উভয়ে (ক্ষুধার সময়) অন্ন ভক্ষণ করতেন, লক্ষ্য কর, কিরূপে আমরা তাদের জন্য প্রমাণগুলিকে বিশদ রূপে বর্ণনা করে দিচ্ছি, অতঃপর আরও দেখ তারা (বিভ্রান্ত হয়ে চলছে) কোন দিকে! জিজ্ঞাসা কর : তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন কছুর ইবাদত করতে থাকবে যারা তোমাদের অনিষ্ট বা ইষ্টি করার কোনও অধিকার রাখে না ! আর আল্লাহ, একমাত্র তিনিই তো হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা মায়েদা : ৭৫-৭৬)

উল্লেখিত হঠকারীদের নিকটে আল্লাহ্ তা'আলার একথাও উল্লেখ কর :

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۝ قَالُواْ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمۖ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ۝﴾ [سبأ: ٤٠، ٤١]

"এবং (স্বরণ করুন সেই দিনের কথা) যে দিন আল্লাহ একত্রে সমবেত করবেন তাদের সকলকে, তারপর ফেরেশতাদিগকে

বলবেন : এরা কি বন্দেগী করত তোমাদের? তারা বলবে: পবিত্রতায় সুমহান আপনি! আপনিই তো আমাদের রক্ষক-অভিভাবক, তারা নয়, কখনই না, বরং অবস্থা ছিল এই যে, এরা পূজা করত জিনদের, এদের অধিকাংশই জিনদের প্রতিই ছিল বিশ্বাসী।"(সূরা সাবা : ৪০-৪১)

অনুরূপভাবে (হঠকারীদের কাছে) আল্লাহর সে বাণীও উল্লেখ কর:

﴿ وَإِذۡ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ءَأَنتَ قُلۡتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيۡنِ مِن دُونِ ٱللَّهِۖ قَالَ سُبۡحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنۡ أَقُولَ مَا لَيۡسَ لِي بِحَقٍّۚ إِن كُنتُ قُلۡتُهُۥ فَقَدۡ عَلِمۡتَهُۥۚ تَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِي وَلَآ أَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِكَۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلۡغُيُوبِ ١١٦ ﴾ [المائدة: ١١٦]

"আর স্মরণ করুন যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা ! আপনি কি লোকদেরকে বলেছিলেন : তোমরা আমাকে ও আমার মাতাকে আল্লাহ ছাড়াও আর দু'টি ইলাহরূপে গ্রহণ কর? ঈসা বলবেন, মহিমময় আপনি ! যা বলার অধিকার আমার নেই আমার পক্ষে তা বলা সম্ভব হতে পারে না, আমি ঐ কথা বলে থাকলে আপনি তা নিশ্চয় অবগত আছেন, আমার অন্তরের বিষয় আপনি বিদিত আছেন কিন্তু আপনার অন্তরের বিষয় আমি অবগত

নই, নিশ্চয় আপনি, একমাত্র আপনিই তো হচ্ছন সকল গায়েবী বিষয়ের সম্যক পরিজ্ঞাত।” (সূরা মায়েদাহ : ১১৬)

তারপর তাকে বল : তুমি কি (এখন) বুঝতে পারলে যে, আল্লাহ প্রতিমা-পুজকদের যেমন কাফের বলেছেন, তেমনি যারা নেক লোকদের শরণাপন্ন হয় তাদেরকেও কাফের বলেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে জেহাদও করেছেন।

তারপর যদি সে বলে : কাফেরগণ (আল্লাহ ছাড়া) তাদের নিকট কামনা করে থাকে আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ মঙ্গল অমঙ্গলের মালিক ও সৃষ্টির পরিচালক, আমি তো তাকে ছাড়া অন্য কারোর নিকট কিছুই কামনা করি না। সৎলোকদের এসব বিষয়ে কিছুই করার নেই, তবে আমি তাদের শরণাপন্ন হই এ জন্য যে, তারা আল্লাহর নিকটে সুপারিশ করবে।

এর জবাব হচ্ছে, এ তো কাফেরদের কথার হুবহু প্রতিধ্বনি মাত্র। তুমি তাকে আল্লাহর এই কালাম শুনিয়ে দাও :

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ﴾ [الزمر: ٣]

“আর আল্লাহকে ব্যতীত অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে যারা (তারা বলে) আমরা তো ওদের ইবাদত করি না, তবে (তাদের শরণাপন্ন হই) যাতে তারা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।” (সূরা যুমার: ৩)

তাছাড়া আল্লাহর এ কালামও তাদের শুনিয়ে দাও :

﴿وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ﴾ [يونس: ١٨]

“তারা (মুশরিকগণ) বলে: এরা হচ্ছে আল্লাহ নিকট আমাদের সুপারিশকারী।” (সূরা ইউনুস : ১৮)

আর জেনে রাখ, উপরোক্ত তিনটি শংসয়[9] ও সন্দেহই হচ্ছে তাদের (বর্তমান কালের মুশরিকদের) সবচেয়ে বড় সন্দেহ। যখন তুমি জানতে পারলে যে আল্লাহ তা‘আলা এগুলোকে তাঁর কিতাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, আর তুমি তা সম্যকভাবে বুঝতে পারবে তখন এর পরবর্তী অন্যান্য সন্দেহসমূহের উত্তর দেওয়া

---

[9] সন্দেহগুলো সংক্ষিপ্তভাবে:

১. তাওহীদুর রবুবিয়্যাহর স্বীকৃতি দেওয়ার পর শির্ক কীভাবে সম্ভব?

২. শির্ক বলতে তো কেবল মূর্তিপূজাকে বুঝায়।

৩. আগেকার মুশরিকরা তো যাদের পূজা বা ইবাদত করত, তাদের কাছেই কোনো কিছু চাইত, কিন্তু সে তো আর তাদের কাছে কিছু চাচ্ছে না, সে তো শুধু তাদের সুপারিশই কামনা করে। [মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আলে আশ-শাইখ, শারহু কাশফিশ শুবহাত, পৃ. ৬৭]

আরও সহজ।

অষ্টম অধ্যায়

দো'আ ইবাদতের সারৎসার

[যারা মনে করে যে, দো'আ ইবাদত নয় তাদের প্রতিবাদ]

যদি সে বলে, আমি আল্লাহ ছাড়া কারোর উপাসনা করি না, আর সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের নিকট (বিপদে) আশ্রয় প্রার্থনা, তাদের ডাকা বা আহ্বান করা, তাদের ইবাদত নয়।

তবে তুমি তাকে বল: তুমি কি স্বীকার কর যে, আল্লাহ ইবাদতকে একমাত্র তাঁরই জন্য খালেস বা বিশুদ্ধ করা তোমার উপর ফরয করেছেন, আর এটা তোমার উপর তাঁর প্রাপ্য হক? যখন সে বলবে হ্যাঁ, আমি তা স্বীকার করি, তখন তাকে বল: এখন আমাকে বুঝিয়ে দাও, কি সেই ইবাদত যা একমাত্র তাঁরই জন্য খালেস করা তোমার উপর তিনি ফরয করেছেন এবং তা তোমার উপর তাঁর প্রাপ্য হক। ইবাদত কাকে বলে এবং তা কত প্রকার তা যদি সে না জানে তবে এ সম্পর্কে তার নিকটে আল্লাহর এই বাণী বর্ণনা করে দাও:

﴿ ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةًۚ﴾ [الاعراف: ٥٥]

“তোমরা ডাক বা আহ্বান কর নিজেদের রবকে বিনীতভাবে ও সংগোপনে”। (সূরা আ‘রাফ : ৫৫)

এটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার পর তাকে জিজ্ঞেস কর, দো‘আ করা (কাউকে ডাকা বা আহ্বান করা) যে ইবাদত সেটা কি এখন বুঝলে? সে অবশ্যই বলবে, হ্যাঁ; আর দো‘আই তো হচ্ছে ইবাদতের নির্যাস বা সারবস্তু। তখন তুমি তাকে বল, যখন তুমি স্বীকার করে নিলে যে, দো‘আ হচ্ছে ইবাদত, আর তুমি আল্লাহকে দিবানিশি ডাকছ ভয়ে সন্ত্রস্ত আর আশায় উদ্দীপিত হয়ে, এই অবস্থায় যখন তুমি কোনো নবীকে অথবা অন্য কাউকে ডাকছ ঐ একই প্রয়োজন মিটানোর জন্য, তখন কি তুমি আল্লাহর ইবাদতে অন্যকে শরীক করছ না? সে তখন অবশ্যই বলতে বাধ্য হবে, হ্যাঁ শরীক করছি বটে !

অতঃপর তাকে বল, যখন আমি আল্লাহর এই বাণী:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢ ﴾ [الكوثر: ٢]

“অতএব তুমি সালাত পড়বে একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং (তাঁর নামেই) নাহর[10]/যবাই কর” (সূরা কাউসার: ২) এর উপর ‘আমল

[10] উটের জন্য সুন্নাত হচ্ছে, নাহর করা। নাহর বলা হয়, দাঁড়ানো অবস্থায় উটের গণ্ডদেশে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করা।

করে আল্লাহর আনুগত্য করে তাঁর নাম নিয়েই তুমি যখন নহর/যবাই করছ তখন সেটা কি ইবাদত নয়? এর জওয়াবে সে অবশ্য বলবে : হ্যাঁ, ইবাদতই বটে। এবার তাকে বল, তুমি যদি কোনো সৃষ্টির জন্য যেমন নবী, জিন বা অন্য কিছুর জন্য কুরবানী কর, তবে কি তুমি এই ইবাদতে আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরীক করলে না ? সে অবশ্যই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে এবং বলবে: হ্যাঁ।

তাকে তুমি একথাও বল : যে মুশরিকদের সম্বন্ধে কুরআন (এর নির্দিষ্ট আয়াত) অবতীর্ণ হয়েছে তারা কি ফেরেশ্‌তা, নেকলোক ও লাত উয্‌যা প্রভৃতির ইবাদত করত? সে অবশ্য বলবে : হ্যাঁ, করত। তারপর তাকে বল, তাদের ইবাদত বলতে তাদেরকে ডাকা বা আহ্বান করা, (তাদের নামে) যবাই করা ও আশ্রয় প্রার্থনা ইত্যাদিই কি নয়? নতুবা তারা তো নিজেদেরকে আল্লাহরই বান্দা ও তাঁরই প্রতাপাধীন বলে স্বীকৃতি দিত। আর একথাও স্বীকার করত যে, আল্লাহই সমস্ত বস্তু ও বিষয়ের পরিচালক। কিন্তু তারা আল্লাহর নিকট তাদের (নেককার লোক, লাত ও উযযা প্রভৃতির) যে মর্যাদা রয়েছে (বলে বিশ্বাস করত) ও সুপারিশ (করার ক্ষমতা) রয়েছে বলে বিশ্বাস করত, সেটার জন্যই তাদের আহ্বান করত বা তাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত। আর এ

বিষয়টি একেবারেই সুস্পষ্ট।

নবম অধ্যায়

শরী‘আতসম্মত শাফা‘আত (সুপারিশ) এবং শিরকী শাফা‘আতের মধ্যে পার্থক্য

যদি সে বলে, তুমি কি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফা‘আতকে অস্বীকার করছ ও তাঁর থেকে নিজেকে নির্লিপ্ত মনে করছ? তুমি তাঁকে উত্তরে বলবে : না, অস্বীকার করি না। তাঁর থেকে নিজেকে নির্লিপ্তও মনে করি না। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই শাফা‘আতকারী, আর তার শাফা‘আত অবশ্যই কবুল করা হবে। আমিও তাঁর শাফা‘আতের আকাঙ্খী। কিন্তু শাফা’আতের যাবতীয় চাবিকাঠি আল্লাহরই হাতে, যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًاۖ﴾ [الزمر: ٤٤]

“বলুন, সকল প্রকারের শাফা‘আতের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ।” (আয-যুমার : ৪৪) আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো শাফা‘আতই অনুষ্ঠিত হবে না। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর হুজুরে সুপারিশ করতে পারে কে আছে এমন ব্যক্তি? (আল বাকারাহ : ২৫৫) আর কারো সম্বন্ধেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাফা'আত করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সম্বন্ধে আল্লাহ শাফা'আতের অনুমতি দিবেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ﴾ [الانبياء: ٢٨]

"আর আল্লাহ মর্জী করেন যার সম্বন্ধে সেই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো জন্য তাঁরা সুপারিশ করবে না।" (সুরা আম্বিয়া : ২৮ আয়াত)।

আর (এটা স্বীকৃত কথা যে) আল্লাহ তা'আলা তাওহীদ (অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেছে, খাঁটি ও নির্ভেজাল ইসলাম গ্রহণ করেছে, এমন লোক) ছাড়া কিছুতেই রাজী হবেন না। যেমন তিনি বলেছেন,

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [ال عمران: ٨٥]

"বস্তুত ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনও দ্বীনের উদ্দেশ্য করবে যে ব্যক্তি, তার পক্ষ থেকে আল্লাহর হুজুরে তা কখনো গৃহীত হবে না।" (আলে ইমরান : ৮৫)।

সুতরাং যখন সাব্যস্ত হলো যে, সমস্ত শাফা‘আত আল্লাহর অধিকারভুক্ত এবং তা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ, আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা অন্য কেউ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শাফা‘আত করতে সক্ষম হবেন না, আর আল্লাহর অনুমতি একমাত্র মুওয়াহ্হিদ (তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকারী) দের জন্যই নির্দিষ্ট, তখন তোমার নিকট একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সকল প্রকারের সমস্ত শাফা‘আতের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। (তাহলে কি তুমি অন্য কারও কাছে এ শাফা‘আত চাইতে পার? কখনও না)

অতএব আমি শাফা‘আত আল্লাহরই নিকট চাই এবং বলি, “হে আল্লাহ ! আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফা‘আত থেকে মাহরূম (বঞ্চিত) করো না। হে আল্লাহ ! তুমি তাঁকে আমার জন্য শাফা‘আতকারী বানিয়ে দাও। অথবা অনুরূপ কিছু বলি।

আর যদি সে বলে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শাফা‘আতের অধিকার দেয়া হয়েছে, কাজেই আমি তাঁর নিকটেই ঐ বস্তু চাচ্ছি যা আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন। তখন তুমি উত্তরে বলবে, আল্লাহ তাঁকে শাফা‘আত করার অধিকার প্রদান করেছেন,

আর সাথে সাথে তিনি তোমাকে তাঁর নিকটে শাফা'আত চাইতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন,

﴿ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا ۝١٨ ﴾ [الجن: ١٨]

"অতএব (তোমরা ডাকবে বা আহ্বান করবে একমাত্র আল্লাহকে এবং) আল্লাহর সঙ্গে আর কাউকেই ডাকবে না[11]।" (জিন: ১৮) সুতরাং যদি তুমি আল্লাহকে এই বলে ডাকবে যে, তিনি যেন তাঁর নবীকে তোমার জন্য সুপারিশকারী করে দেন, তখন তুমি আল্লাহর এই নিষেধ বাণী :

﴿ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا ۝١٨ ﴾ [الجن: ١٨]

"আল্লাহর সঙ্গে আর কাউকেই ডাকবে না। (সুরা জিন : ১৮) এটাকেও যথাযথভাবে পালন কর[12]।

আরও একটি কথা হচ্ছে যে, সুপারিশের অধিকার নবী ব্যতীত অন্যদেরও দেয়া হয়েছে। যেমন, ফেরেশতারা সুপারিশ করবেন,

---

[11] কারণ, কারও কাছে কিছু চাইতে হলে, তাকে আহ্বান করতে হয়। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সুপারিশ চাওয়ার অর্থ হচ্ছে তাকে ডাকা, যা আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। [সম্পাদক]

[12] অর্থাৎ এটাকে যথাযথভাবে পালন করলে আর নবীর কাছে শাফা'আত চাইতে পারবে না। কারণ, চাওয়া তো কেবল আল্লাহর কাছে। এটাই তো উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে।

ওলীগণও সুপারিশ করবেন। মা‘সুম বাচ্চারাও (তাদের পিতামাতাদের জন্য) সুপারিশ করবেন। কাজেই তুমি কি সেই অবস্থায় বলতে পারো যে, যেহেতু আল্লাহ তাদেরকে সুপারিশের অধিকার দিয়েছেন, কাজেই তাদের কাছেও তোমরা শাফা‘আত চাইবে? যদি তা চাও তবে তুমি নেক ব্যক্তিদের উপাসনায় শামিল হ’লে। যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে (হারাম বা অবৈধ বলে) উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে তুমি যদি বল, ‘না, (তাদের কাছে সুপারিশ চেয়ে বেড়াই না), তবে সেই অবস্থায় তোমার এই কথা স্বতঃসিদ্ধভাবে বাতেল হয়ে যাচ্ছে যে, আল্লাহ তাকে সুপারিশের অধিকার প্রদান করেছেন এবং আমি তার নিকট সেই বস্তুই চাচ্ছি যা তিনি তাকে দান করেছেন।”

দশম অধ্যায়

[এ কথা সাব্যস্ত করা যে, নেক লোকদের নিকট বিপদে আপদে আশ্রয় প্রার্থনা করা শির্ক এবং যারা একথা অস্বীকার করে তাদেরকে সেটা মেনে নিতে বাধ্য করা]

যদি সে বলে : আমি আল্লাহর সঙ্গে কোনো বস্তুকেই শরীক করি না— কিছুতেই নয়, কক্ষণও নয়। তবে নেক লোকদের নিকট বিপদে আপদে আশ্রয় প্রার্থনা করা শির্ক নয়।

এর জওয়াবে তাকে বল, যখন তুমি স্বীকার করে নিয়েছ যে, ব্যভিচার অপেক্ষা শির্ককে আল্লাহ তা‘আলা অধিক গুরুতর হারাম বলে নির্দেশিত করেছেন, আর এ কথাও মেনে নিয়েছ যে, আল্লাহ তা‘আলা এই মহা পাপ ক্ষমা করেন না, তাহলে (তুমি বল) সেটা কি বস্তু যা তিনি হারাম করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, তিনি তা ক্ষমা করবেন না? কিন্তু এ বিষয়ের উত্তর সে জানে না।

তখন তাকে তুমি বল, তুমি শির্ক কী তা জানলে না, তখন তা থেকে আত্মরক্ষা কীভাবে করবে? অথবা একথাও জানলে না যে, কেন আল্লাহ তোমার উপর শির্ক হারাম করেছেন আর বলে দিয়েছেন যে, তিনি ঐ পাপ মা’ফ করবেন না। আর তুমি এ

বিষয়ে কিছুই জানলে না এবং সেটা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাও করলে না। তুমি কি ধারণ করে বসে আছ যে, আল্লাহ এটাকে হারাম করেছেন আর তিনি সেটাকে বর্ণনা ব্যতীতই ছেড়ে দিবেন?

যদি সে বলে, শির্ক হচ্ছে মূর্তিপূজা, আর আমরা তো মূর্তিপূজা করছি না, তবে তাকে বল, মূর্তিপূজা কাকে বলে? তুমি কি মনে কর যে, মুশরিকগণ এই বিশ্বাস পোষণ করত যে এসব কাঠ ও পাথর (নির্মিত মূর্তিগুলো) যারা তাদেরকে আহ্বান করে তাদেরকে সৃষ্টি, রেযেক প্রদান কিংবা তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সক্ষম? একথা তো কুরআন মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছে[13]।

যদি সে বলে, শির্ক হচ্ছে যারা কাঠ ও পাথর নির্মিত মূতি বা কবরের উপর নির্মিত সৌধ ইত্যাদিকে লক্ষ্য করে নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য এদের প্রতি আহ্বান জানায়, এদের উদ্দেশ্যে বলীদান করে এবং বলে যে, এরা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে নিয়ে যাবে, আর এদের বরকতে আল্লাহ আমাদের বিপদ-আপদ দূর করবেন বা আল্লাহ এদের বরকতে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। তবে তাকে বল : হ্যাঁ,

[13] অর্থাৎ কুরআন তো বলছে যে তৎকালীন আরবের মুশরিকরা কখনও এসব কাঠ, পাথর ইত্যাদিকে সৃষ্টি, রিযিক কিংবা নিয়ন্ত্রক দাবী করত না। তাহলে তোমার দাবী কুরআনের ঘোষণার বিপরীত হচ্ছে, সুতরাং তোমার কথা মিথ্যা।

তুমি সত্য কথাই বলেছ, আর এটাই তো তোমাদের কর্মকান্ড যা পাথর, কবরের সৌধ প্রভৃতির নিকটে তোমরা করে থাক। ফলত: সে স্বীকার করছে যে, তাদের এই কাজগুলোই হচ্ছে মুর্তিপূজা, আর এটাই তো আমরা চাই[14]।

তাকে একথাও বলা যেতে পারে, তুমি বলছ শির্ক হচ্ছে মূর্তিপূজা, তবে কি তুমি বলতে চাও যে, শুধু মূর্তিপূজার মধ্যেই শির্ক সীমিত, অর্থাৎ এর বাইরে কোনো শির্ক নেই? "নেক লোকদের প্রতি ভরসা করা আর তাদেরকে আহ্বান করা শির্কের মধ্যে কি গণ্য নয়?" (যদি তুমি এরূপ দাবী কর, তবে) তোমার এ দাবী তো আল্লাহ তাঁর কুরআনে খণ্ডন করেছেন; কারণ যারা ফেরেশতা, ঈসা এবং নেক-লোকদের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করেছে, তাদেরকে তিনি কুফরি করেছে বলে বর্ণনা করেছেন। ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপেই সে তোমার কাছে এ সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতে কোনো নেক বান্দাকে

[14] অর্থাৎ তোমরা নিজেরাই তোমাদের কথায় আমাদের বক্তব্য প্রকারান্তরে মেনে নিলে যে তোমরা শির্ক করে যাচ্ছ। আর এভাবেই আমাদের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত হচ্ছে, সেটা হচ্ছে, তার কাছ থেকে হকের স্বীকৃতি আদায় করা। তার সন্দেহ দূর করা, আমাদের উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে তার সন্দেহ দূরীভূত হলো, তার প্রমাণাদি খণ্ডিত হলো, তার ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতা প্রকাশিত হয়ে পড়ল। [মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আলে আশ-শাইখ, শারহু কাশফিশ শুবহাত, পৃ.৭৯]

শরীক করে তার সেই কাজকেই কুরআনে শির্ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এইটিই তো আমার উদ্দেশ্য[15]।

এই বিষয়ের গোপন রহস্য হচ্ছে,

যখন সে বলে, আমি আল্লাহর সঙ্গে (কাউকে) শরীক করি না,

তখন তুমি তাকে বল, আল্লাহর সঙ্গে শির্কের অর্থ কি? তুমি তার ব্যাখ্যা দাও।

যদি সে এর ব্যাখ্যায় বলে, তা হচ্ছে মূর্তিপূজা,

তখন তুমি তাকে আবার প্রশ্ন কর, মূর্তি পূজার মানে কি? তুমি আমাকে তার ব্যাখ্যা প্রদান কর।

যদি সে উত্তরে বলে, আমি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করি না,

তখন তাকে আবার প্রশ্ন কর, একমাত্র আল্লাহর ইবাদতেরই বা অর্থ কি? এর ব্যাখ্যা দাও। উত্তরে যদি সে কুরআন যে ব্যাখ্যা

---

[15] অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা প্রমাণ করা যে, সৎলোকদেরকে আহ্বান করা, তাদের উপর ভরসা করাও শির্ক, কারণ তা কুরআন তা বর্ণনা করেছে; আর তোমার কথা দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে। ফলে তার সন্দেহ দূরীভূত হলো, তার প্রমাণাদি খণ্ডিত হলো। [মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আলে আশ-শাইখ, শারহু কাশফিশ শুবহাত, পৃ.৮০]

প্রদান করেছে[16] সেই ব্যাখ্যাই দেয় তবেতো আমাদের দাবীই সাব্যস্ত হচ্ছে, আর এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আর যদি সে তা না জানে[17], তবে সে কেমন করে এমন বস্তুর দাবী করছে যা সে জানে, তবে সে কেনম করে এমন বস্তুর দাবী করছে যা সে জানে না?

আর যদি সে তার এমন ব্যাখ্যা প্রদান করে যা তার প্রকৃত অর্থ নয়, তখন তুমি তার নিকটে আল্লাহর সঙ্গে শির্ক এবং মূর্তিপূজা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলো বর্ণনা করে দাও। আরও বর্ণনা করে দাও যে এ কাজটিই হুবহু করে চলেছে এ যুগের মুশরিকগণ। আরও বর্ণনা কর যে, শরীকবিহীন একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের বিষয়টিই তো তারা আমাদের কাছ থেকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে এবং শোরগোল করছে, যেমন তাদের পূর্বসূরীরা করেছিল এবং বলেছিল,

﴿ أَجَعَلَ ٱلۡأٓلِهَةَ إِلَٰهٗا وَٰحِدًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عُجَابٞ ۝٥ ﴾ [ص: ٥]

---

[16] অর্থাৎ অপর কারও ইবাদত করা যাবে না, কাউকে ডাকা যাবে না, কারও উপর ভরসা করা যাবে না ইত্যাদি।

[17] অর্থাৎ শির্ক কী? মুশরিক কে? মূর্তিপূজা কী, মূর্তিপূজা ও অন্যকিছুর মধ্যে পার্থক্য না জানে তবে তো সে অজ্ঞ, তার সাথে তর্ক না করে তাকে জ্ঞান দিতে হবে। বর্তমান কালের অধিকাংশ মানুষ এ শ্রেণির। [মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আলে আশ-শাইখ, শারহু কাশফিশ শুবহাত, পৃ.৮১]

“এই লোকটি কি বহু উপাস্যকে এক উপাস্যে পরিণত করছে? এ তো ভারী এক আশচর্য্য ব্যাপার !” (সূরা সাদ : ৫)

অতঃপর সে যদি বলে, ফেরেশতা ও আম্বিয়াদের ডাকার কারণে তাদেরকে তো কাফের বলা হয় নি; বরং ফেরেশতাদেরকে যারা আল্লাহর কন্যা বলেছিল তাদেরকেই কাফের বলা হয়েছিল। আমরা তো আবদুল কাদের বা অন্যদেরকে আল্লাহর পুত্র বলি না।

তার উত্তর হচ্ছে এই যে, (ফেরেশতা ও আম্বিয়াদেরকে ডাকা অবশ্যই শির্ক। সেটা বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো আয়াতে আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করাকে কুফরী বলা হয়েছে; কারণ) সন্তানকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত করাটাই স্বয়ং আলাদা কুফরী। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ ﴾ [الاخلاص: ١، ٢]

“বল, তিনিই একক আল্লাহ (তিনি ব্যতীত আল্লাহ আর কেউ নেই) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী[18]” (সূরা ইখলাস : ১-২ আয়াত]

[18] সুতরাং তার সন্তান সাব্যস্ত করা হবে, তখন সেটার প্রতি আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। সুতরাং আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা কুফরী। কারণ এটি ‘সামাদ’ এর বিপরীত।

“আহাদ” এর অর্থ হ’ল, তিনি একক এবং তার সমতুল্য কেউই নেই। আর “সামাদ” এর অর্থ হচ্ছে, প্রয়োজনে একমাত্র যার স্মরণ নেয়া হয়। অতএব যে এটাকে অস্বীকার করবে, সে কাফের হয়ে যাবে[19] -যদিও সে সূরাটিকে অস্বীকার করে না।

আর আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٖ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنۡ إِلَٰهٍۚ ﴾ [المؤمنون: ٩١]

“আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি, আর তাঁর সঙ্গে অপর কোনো ইলাহ্ও (উপাস্য) নেই।” (মুমিনুন : ৯১) এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা কুফরীর দুটি প্রকরণের উল্লেখ করেছেন, আর তিনি এতদোভয়কেই পৃথক ভাবে কুফরি সাব্যস্ত করেছেন।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلۡجِنَّ وَخَلَقَهُمۡۖ وَخَرَقُواْ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَٰتِۭ بِغَيۡرِ عِلۡمٖۚ﴾ [الانعام: ١٠٠]

“আর এই (অজ্ঞ) লোকগুলো জিনকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছে অথচ ঐ গুলোকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁর জন্য

---

[19] অর্থাৎ আল্লাহর সামাদ বা সন্তান থেকে অমুখাপেক্ষীতা অস্বীকার করবে, সে কাফের হয়ে যাবে।

তারা কতকগুলো পুত্র-কন্যাও উদ্ভাবন করে নিয়েছে কোন জ্ঞান ব্যতিরেকে—কোন যুক্তি প্রমাণ ছাড়া।" (আন'আম :১০০) এ আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা দুই প্রকারের কুফরীকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছেন।

এর প্রমাণ এটাও হতে পারে যে, যারা লাতকে আহ্বান করে কাফের হয়ে গিয়েছিল, যদিও লাত ছিল একজন সৎলোক। তারা তাকে আল্লাহর ছেলেও বলেনি। অনুরূপভাবে যারা জিনদের পূজা করে কাফের হয়ে গিয়েছিল তারাও তাদেরকে আল্লাহর ছেলে বলে নি[20]।

তদ্রূপ "মুরতাদ" (যারা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে যায় তাদের) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে চার মাযহাবের আলেমগণ বলেছেন যে, মুসলিম যদি ধারণা রাখে যে, আল্লাহর ছেলে রয়েছে তবে সে "মুরতাদ" হয়ে গেল। তারাও উক্ত দুই প্রকারের কুফরীর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এটা তো খুবই স্পষ্ট।

---

[20] অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে কাফের বলেছেন, অথচ তারা আল্লাহর জন্য পুত্র কিংবা সন্তান সাব্যস্ত করেনি। সুতরাং তোমাদের পূর্বোক্ত দাবী অসার, যাতে তোমরা দাবী করেছিলে যে, তাদেরকে সন্তান সাব্যস্ত করার জন্যই কেবল কাফের বলা হয়েছে, সৎলোকদের আহ্বানের জন্য নয়। বস্তুত: যারা লাতকে আহ্বান করে কাফের হয়েছিল কিংবা জিনদের ইবাদত করে কাফের হয়েছে, তারা তো আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত না করেও কাফের হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং সন্তান সাব্যস্ত করলে যেমন কুফরী করা হয়, তেমনি আল্লাহ ব্যতীত অপর কাউকে আশ্রয়ের জন্য আহ্বানও কুফরিতে নিমজ্জিত করে। [সম্পাদক]

আর যদি সে আল্লাহর এই কালাম পেশ করে :

﴿ أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢ ﴾ [يونس: ٦٢]

“সাবধান, আল্লাহর ওলী যারা, কোনো আশঙ্কা নেই তাদের এবং কখনো চিন্তাগ্রস্তও হবে না তারা।” (ইউনুস : ৬২)

তবে তুমি বল : হ্যাঁ, একথা তো অভ্রান্ত সত্য, কিন্তু তাই বলে তাদের পূজা করা চলবে না।

আর আমরা কেবল আল্লাহর সঙ্গে অপর কারো পূজা এবং তার সঙ্গে শির্কের কথাই উল্লেখ (করে তা অস্বীকার) করছি। নচেৎ আওলিয়াদের প্রতি ভালোবাসা রাখা ও তাদের অনুসরণ করা এবং তাদের কারামতগুলোকে স্বীকার করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর আওলিয়াদের কারামতকে বিদ‘আতী ও বাতিলপন্থীগণ ছাড়া কেউ অস্বীকার করে না।

আল্লাহর দ্বীন দুই প্রান্ত সীমার (অতিরঞ্জন ও কমতি করার) মধ্যস্থলে, আর বিপরীতমুখী ভ্রষ্টতার মাঝখানে হেদায়াত এবং দুই বাতিলের মধ্যপথে অবস্থিত হক।

একাদশ অধ্যায়

[আমাদের যুগে লোকদের শির্ক অপেক্ষা পূর্ববর্তী লোকদের শির্ক ছিল অপেক্ষাকৃত হালকা (দু'দিক থেকে)]

তুমি যখন বুঝতে পারলে যে, যে বিষয়টিকে আমাদের যুগের মুশরিকগণ নাম দিয়েছেন ই'তেকাদ'—(ভক্তি মিশ্রিত বিশ্বাস)[21] সেটাই হচ্ছে সেই শির্ক; যার বিরুদ্ধে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহর রাসূল যার কারণে লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। তখন তুমি জেনে রাখ যে, পূর্ববর্তী লোকদের শির্ক ছিল বর্তমান যুগের লোকদের শির্ক অপেক্ষা অধিকতর হালকা বা লঘুতর। আর তার কারণ হচ্ছে দু'টি:

এক. পূর্ববর্তী লোকগণ কেবল সুখ স্বাচ্ছন্দের সময়েই আল্লাহর সঙ্গে অপরকে শরীক করতো এবং ফেরেশতা আওলিয়া ও ঠাকুর-দেবতাদেরকে আহবান জানাতো, কিন্তু বিপদ আপদের সময় একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতো, সে ডাক হ'ত সম্পূর্ণ নির্ভেজাল। যেমন আল্লাহ তাঁর পাক কুরআনে বলেছেন:

---

[21] অর্থাৎ তারা ওলি, কবর, মাযার বা পীরদের সম্পর্কে বাড়াবাড়ি বা ওসীলা গ্রহণের যে বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। [সম্পাদক]

﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلۡبَحۡرِ ضَلَّ مَن تَدۡعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ أَعۡرَضۡتُمۡۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ كَفُورًا ٦٧ ﴾ [الاسراء: ٦٧]

"সাগর বক্ষে যখন কোন বিপদ তোমাদেরকে স্পর্শ করে, আল্লাহ ব্যতীত আর যাদেরকে ডেকে থাক তোমরা, তারা সকলেই তো তখন (মন হ'তে দূরে) সরে যায়, কিন্তু আল্লাহ যখন তোমাদেরকে স্থলভাগে পৌঁছিয়ে উদ্ধার করেন, তখন তোমরা অন্যদিকে ফিরে যাও; নিশ্চয় মানুষ হচ্ছে অতিশয় না অকৃতজ্ঞ।" (বনী ইসরাঈল : ৬৭)

আল্লাহ এ কথাও বলেছেন:

﴿ قُلۡ أَرَءَيۡتَكُمۡ إِنۡ أَتَىٰكُمۡ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوۡ أَتَتۡكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيۡرَ ٱللَّهِ تَدۡعُونَ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٤٠ بَلۡ إِيَّاهُ تَدۡعُونَ فَيَكۡشِفُ مَا تَدۡعُونَ إِلَيۡهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوۡنَ مَا تُشۡرِكُونَ ٤١ ﴾ [الانعام: ٤٠، ٤١]

"বল, তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে বিবেচনা করে দেখ। তোমাদের প্রতি আল্লাহর কোন আযাব যদি আপতিত হয় অথবা কিয়ামত দিবস যদি এসে পড়ে তখন কি তোমরা আহ্বান করবে আল্লাহ ব্যতীত অপর কাউকেও? (উত্তর দাও) যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কখনই না, বরং তোমরা আহ্বান করবে তাঁকে, অতঃপর যে আপদের কারণে তাঁকে আহ্বান করছ, ইচ্ছা করলে তিনি সেই

আপদগুলো দূর করে দিবেন। (আহ্বানের কারণস্বরূপ আপদগুলো মোচন করে দিবেন) আর তোমরা যা কিছুকে আল্লাহর শরীক করছ তাদেরকে তোমরা তখন ভূলে যাবে।” (আন‘আম :৪০-৪১)

আল্লাহ তা‘আলা একথাও বলেছেন:

﴿ ۞وَإِذَا مَسَّ ٱلۡإِنسَٰنَ ضُرّٞ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيۡهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعۡمَةٗ مِّنۡهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدۡعُوٓاْ إِلَيۡهِ مِن قَبۡلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادٗا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦۚ قُلۡ تَمَتَّعۡ بِكُفۡرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِ ٨ ﴾ [الزمر: ٨]

“যখন কোন দু:খ কষ্ট আপতিত হয় মানুষের উপর তখন সে নিজ রবকে ডাকতে থাকে তদ্‌গতভাবে, অতঃপর যখন তিনি তাকে কোনো নেয়ামতের দ্বারা অনুগৃহীত করেন, তখন সে ভুলে যায় সেই বস্তুকে যার জন্য সে পূর্বে প্রার্থনা করেছিল এবং আল্লাহর বহু সদৃশ ও শরীক বানিয়ে নেয়; তাঁর পথ থেকে (লোকদেরকে) ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে। বল, কিছুকাল তুমি নিজের কুফরজনিত সুখ সুবিধা ভোগ করলেও, নিশ্চয় তুমি হচ্ছ জাহান্নামের অধিবাসীদের একজন।” (যুমার : ৮)

আর আল্লাহর এই বাণী :

﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوۡجٌ كَٱلظُّلَلِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [لقمان: ٣٢]

"যখন পর্বতের ন্যায় তরঙ্গমালা তাদের উপর ভেঙ্গে পড়ে, তখন তারা আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে তাঁকে ডাকতে থাকে।" (সূরা লোকমান: ৩২)

যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হ'ল যা আল্লাহ তাঁর কেতাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন- যার সারৎসার হচ্ছে এই যে, যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধে করেছিলেন তারা তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার সময়ে আল্লাহকেও ডাকতো আবার আল্লাহ ছাড়া অন্যকেও ডাকতো, কিন্তু বিপদ-বিপর্যয়ের সময় তারা একক ও লা শরীক আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকেই ডাকতো না, তারা বরং সে সময় অন্য সব মাননীয় ব্যক্তি ও পূজ্য সত্তাদের ভুলে যেতো, সেই ব্যক্তির নিকট পূর্ব যামানার লোকদের শির্ক এবং আমাদের বর্তমান যুগের লোকদের শির্কের পার্থক্যটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এমন লোক কোথায় পাওয়া যাবে যার হৃদয় এই বিষয়টি উত্তমরূপে ও গভীর ভাবে উপলব্ধি করবে ? একমাত্র আল্লাহই আমাদের সহায় !

(দুই) পূর্ব যামানার লোকগণ আল্লাহর সঙ্গে এমন ব্যক্তিদের আহ্বান করতো যারা ছিল আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত, তারা হয় নবী-রাসূলগণ, নয় তো ওলী-আওলীয়া, নতুবা ফেরেশতাগণ। এছাড়া তারা হয়তো পূজা করতো এমন বৃক্ষ অথবা পাথরের যারা আল্লাহর একান্ত বাধ্য ও হুকুমবরদার, কোনোক্রমেই তারা অবাধ্য নয়, আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী নয়।

কিন্তু আমাদের এই যুগের লোকেরা আল্লাহর সঙ্গে এমন লোকদের ডাকে এবং তাদের নিকট প্রার্থনা জানায় যারা নিকৃষ্টতম অনাচারী (ফাসেক), আর যারা তাদের নিকট ধর্ণা দেয় ও প্রার্থনা জানায় তারাই তাদের অনাচারগুলোর কথা ফাঁস করে দেয়, সে অনাচারগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যভিচার, চুরি এবং নামায পরিত্যাগের মত গর্হিত কাজসমূহ। আর যারা নেক লোকদের প্রতি আস্থা রেখে তাদের পূজা করে বা এমন বস্তুর পূজা করে যেগুলো কোন পাপ করে না— যেমন : গাছ, পাথর ইত্যাদি, তারা ঐ সব লোকদের থেকে নিশ্চয় লঘুতর পাপী যারা ঐ লোকদের পূজা করে যাদের অনাচার ও পাপাচারগুলোকে তারা স্বয়ং দর্শন করে থাকে এবং তার সাক্ষ্যও প্রদান করে থাকে[22]।

---

[22] তবে এটা সত্য যে উভয়টিই শির্ক। উভয় গোষ্ঠীই জাহান্নামের অধিবাসী, যদি না তাওবাহ করে, এখানে গ্রন্থকার শুধু দু'যুগের শির্কের পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। [সম্পাদক]

দ্বাদশ অধ্যায়

[‘যে ব্যক্তি দ্বীনের কতিপয় ফরয ওয়াজেব অর্থাৎ অবশ্যকরণীয় কর্তব্য পালন করে, সে তাওহীদ বিরোধী কোন কাজ করে ফেললেও কাফের হয়ে যায় না।’ যারা এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, তাদের ভ্রান্তির নিরসন এবং তার বিস্তারিত প্রমাণপঞ্জি।]

উপরের আলোচনায় একথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, যাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদ করেছেন তারা এদের (আজকের দিনে শির্কী কাজে লিপ্ত নামধারী মুসলিমদের) চাইতে ঢের বেশী বুদ্ধিমান ছিল এবং তাদের শির্ক অপেক্ষাকৃত লঘু ছিল।

অতঃপর একথাও তুমি জেনে রাখো যে, এরা আমাদের বক্তব্যের ব্যাপারে একটি সংশয় উপস্থাপন করে, যা তাদের অন্যতম বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ। অতএব এই ভ্রান্তির অপনোদন ও সন্দেহের অবসানকল্পে নিম্নের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোন।

তারা বলে থাকে: যাদের প্রতি সাক্ষাতভাবে কুরআন নাযিল হয়েছিল (অর্থাৎ মক্কার কাফির মুশরিকগণ) তারা ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা‘বুদ নেই’ একথার সাক্ষ্য প্রদান করে নি, তারা

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মিথ্যা বলেছিল, তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছিল, তারা কুরআনকে মিথ্যা বলেছিল এবং বলেছিল এটা একটা জাদু-মন্ত্র। কিন্তু আমরা তো সাক্ষ্য দিয়ে থাকি যে, আল্লাহ ছাড়া নেই কোনো মা‘বুদ এবং (এ সাক্ষ্যও দেই যে,) নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল, আমরা কুরআনকে সত্য বলে জানি ও মানি আর পুনরুত্থান এর উপর বিশ্বাস রাখি, আমরা নামায পড়ি এবং রোযাও রাখি, তবু আমাদেরকে এদের (উক্ত বিষয়ে অবিশ্বাসী কাফেরদের) মত মনে কর কেন?

এর জওয়াব হচ্ছে এই যে, এ বিষয়ে সমগ্র ‘আলেম সমাজ তথা শরী‘আতের বিদ্বান মণ্ডলী একমত যে, একজন লোক যদি কোনো কোনো ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য বলে মানে, আর কোনো কোনো বিষয়ে তাঁকে মিথ্যা বলে ভাবে, তবে সে নির্ঘাত কাফের, সে ইসলামে প্রবিষ্টই’ হতে পারে না; এই একই কথা প্রযোজ্য হবে তার উপরেও যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু অংশ বিশ্বাস করল, আর কতক অংশকে অস্বীকার করল, যেমন কেউ তাওহীদকে স্বীকার করল কিন্তু নামায যে ফরয তা মেনে নিল না। অথবা তাওহীদও স্বীকার করল, নামাযও পড়ল কিন্তু যাকাত যে ফরয তা মানল না; অথবা এগুলো সবই স্বীকার করল কিন্তু রোযাকে অস্বীকার করে বসল

কিংবা ঐগুলো সবই স্বীকার করল কিন্তু একমাত্র হজ্বকে অস্বীকার করল, এরা সবাই হবে কাফের।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় কতক লোক হজ্বকে মেনে নিতে চায় নি বলে[23] তাদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন,

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧ ﴾ [ال عمران: ٩٧]

“(পথের কষ্ট সহ্য করতে এবং) রাহা খরচ বহনে সক্ষম যে ব্যক্তি সে (শ্রেণির) সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহের (কা‘বাতুল্লাহর) হজ্ব করা অবশ্য কর্তব্য, আর যে ব্যক্তি তা অমান্য করল (সে জেনে রাখুক যে,) আল্লাহ হচ্ছেন সমুদয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী” [আলে ইমরান: ৯৭]

কোনো ব্যক্তি যদি এগুলো সমস্তই (অর্থাৎ তাওহীদ, নামায, যাকাত, রামাযানের সিয়াম, হজ্ব) মেনে নেয়, কিন্তু পুনরুত্থানের কথা অস্বীকার করে, সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যাবে। তার

[23] শাইখের এ বাক্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার একটি প্রেক্ষাপট এটি। কিন্তু এ কথার সমর্থনে দলীল পাওয়া যায় নি। (ইবন উসাইমীন, শারহু কাশফিশ শুবুহাত, পৃ. ৯১)।

রক্ত এবং তার ধন-দৌলত সব হালাল হবে (অর্থাৎ তাকে হত্যা করা এবং তার ধন-মাল গ্রহণ করা আইন-সিদ্ধ হবে) যেমন আল্লাহ বলেছেন :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ حَقّٗاۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ١٥١ ﴾ [النساء: ١٥٠، ١٥١]

“নিশ্চয় যারা আমান্য করে আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলদেরকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের (আনুগত্যের) মধ্যে প্রভেদ করতে চায়, আর বলে কতককে আমরা বিশ্বাস করি অপর কতককে অমান্য করি এবং তারা ঈমানের ও কুফরের মাঝামাঝি একটা পথ আবিষ্কার করে নিতে চায়— এই যে লোক সত্যই তারা হচ্ছে কাফের, বস্তুত কাফেরদের জন্য আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি এক লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।” (আন নিসা: ১৫০-১৫১)

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা যেহেতু তাঁর কালামে পাকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি দ্বীনের কিছু অংশকে মানবে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করবে, সে সত্যিকারের কাফের এবং তার

প্রাপ্য হবে সেই বস্তু (শাস্তি) যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে, সেহেতু এ সম্পর্কিত ভ্রান্তিরও অপনোদন ঘটেছে[24]।

আর এ বিষয়টি জনৈক 'আহ্সা'-বাসী আমার নিকট প্রেরিত তার পত্রে উল্লেখ করেছেন।

আর তাকে এ-কথাও বলা যাবে, তুমি যখন স্বীকার করছ যে, যে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলকে সত্য জানবে আর কেবল নামাযের ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে, সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হবে, আর তার জান-মাল হালাল হবে; অনুরূপভাবে সব বিষয় মেনে নিয়ে যদি পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তবুও সে কাফের হয়ে যাবে।

তদ্রূপ সে কাফের হয়ে যাবে যদি ঐ সমস্ত বস্তুর উপর ঈমান আনে, আর কেবলমাত্র রামযানের রোযাকে অস্বীকার করে। এতে কোনো মাযহাবেরই দ্বিমত নেই। আর কুরআনও এ কথাই বলেছে, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বলেছি।

আর এটা জানা কথা যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব ফরয কাজ নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে তাওহীদ হচ্ছে

[24] সুতরাং কিছু কিছু বস্তুর ঈমান থাকার পরও কুফরী কিংবা শির্ক করার কারণে তারা ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে। [সম্পাদক]

সর্বাপেক্ষা বড় এবং তা নামায, রোযা ও হজ্ব হতেও শ্রেষ্ঠতর। তাহলে যখন মানুষ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনীত ফরয, ওয়াজিবসমূহের সবগুলোকে মেনে নিয়ে ঐগুলোর একটি মাত্র অস্বীকার করে কাফের হয়ে যায় তখন কি করে সে কাফের না হয়ে পারে যদি সমস্ত রাসূলদের দ্বীনের মূলবস্তু তাওহীদকেই সে অস্বীকার করে বসে? সুবহানাল্লাহ ! কি বিস্ময়কর এই মুর্খতা !

তাকে এ কথাও বলা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ বানু হানীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, অথচ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা সাক্ষ্য প্রদান করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ্ নেই, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। এ ছাড়া তারা আযানও দিত এবং নামাযও পড়ত।

সে যদি বলে যে, তারা তো মুসায়লামা (কায্যাব)-কে একজন নবী বলে মেনেছিল। তবে তার উত্তরে বলবে : ঐটিই তো আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা যদি কেউ কোনো ব্যক্তিকে নবীর মর্যাদায় উন্নীত করার কারণে কাফের হয়ে যায় এবং তার জান মাল হালাল হয়ে যায়, এই অবস্থায় তার দু'টি সাক্ষ্য (প্রথম সাক্ষ্য:

আল্লাহ ছাড়া নেই অপর কোনো সত্য ইলাহ, দ্বিতীয় সাক্ষ্য: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল) তার কোনই উপকার সাধন করবে না। নামাযও তার কোনো উপকার করতে সক্ষম হবে না। অবস্থা যখন এই, তখন সেই ব্যক্তির পরিণাম কি হবে যে, শামসান, ইউসুফ[25] বা কোনো সাহাবী বা নবীকে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করে? পাকপবিত্র তিনি, তাঁর শান-শওকত কত উচ্চ !

﴿ كَذَٰلِكَ يَطۡبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ۝٥٩ ﴾ [الروم: ٥٩]

"আল্লাহ এ ভাবেই যাদের জ্ঞান নেই, তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন।" (সূরা রূম : ৫১)

প্রতিপক্ষকে এটাও বলা যাবে, আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে মেরেছিলেন তারা সকলেই ইসলামের দাবীদার ছিল এবং 'আলীর অনুগামী ছিল, অধিকন্তু তারা সাহাবীগণের নিকটে শিক্ষা লাভ করেছিল। কিন্তু তারা আলীর সম্বন্ধে ঐ রূপ বিশ্বাস রাখত যেমন ইউসুফ, শামসান এবং তাদের মত আরও অনেকের সম্বন্ধে (এখন) বিশ্বাস পোষণ করা হয়। (প্রশ্ন হচ্ছে) তাহলে কি করে সাহাবীগণ তাদেরকে (ঐ ভাবে) হত্যা করার

[25] নিকট অতীতে (গ্রন্থকারের সময়কালে) নাজদে এদের উদ্দেশ্যে পূজা করা হত।

ব্যাপারে এবং তাদের কুফরীর উপর একমত হলেন? তা হলে তোমরা কি ধারণা করে নিচ্ছ যে, সাহাবীগণ মুসলিমকে কাফের রূপে আখ্যায়িত করেছেন? নাকি তোমরা ধারণা করছ যে, 'তাজ' এবং তার অনুরূপ অন্যান্যের উপর বিশ্বাস রাখা ক্ষতিকর নয়, কেবল 'আলীর প্রতি ভ্রান্ত বিশ্বাস রাখাই কুফরী?

আর এ কথাও বলা যেতে পারে যে, বানু আব্বাসের শাসনকালে যে বানু ওবায়দ আল-কাদ্দাহ মরক্কো প্রভৃতি দেশে ও মিসরে রাজত্ব করেছিল, তারা সকলেই 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ" কলেমার সাক্ষ্য দিত— ইসলামকেই তাদের ধর্ম বলে দাবী করত। জুম'আহ্ ও জামা'আতে নামাযও আদায় করত। কিন্তু যখন তারা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের চাইতেও লঘু কোনো কোনো বিষয়ে শরী'আতের বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণের কথা প্রকাশ করল, তখন তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপর 'আলেম সমাজ একমত হলেন। আর তাদের দেশকে দারুল হরব বা যুদ্ধের দেশ বলে ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে মুসলিমগণ যুদ্ধ করলেন। আর মুসলিমদের শহরগুলোর মধ্যে যেগুলো তাদের হস্তগত হয়েছিল তা পুনরুদ্ধার করে নিলেন।

তাকে আরও বলা যেতে পারে যে, পূর্ব যুগের লোকদের মধ্যে যাদের কাফের বলা হতো তাদের যদি এজন্যই তা বলা হত যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনকে মিথ্যা জানা এবং পুনরুত্থান প্রভৃতিকে অস্বীকার করা প্রভৃতি (কুফরী কাজ) একত্রে করেছিল— তাহলে “বাবু হুকমিল মুরতাদ” বা “মুরতাদের[26] হুকুম” নামীয় অধ্যায় কী অর্থ বহন করবে, যা সব মাযহাবের আলেমগণ বর্ণনা করেছেন?

সে অধ্যায়ে তারা মুরতাদ্দের বিভিন্ন প্রকরণের উল্লেখ করেছেন, আর প্রত্যেক প্রকারের মুরতাদকে কাফের বলে নির্দেশিত করে তাদের জান এবং মাল হালাল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এমনকি তারা অনেকের নিকট কতিপয় সাধারণ বিষয় যেমন অন্তর হতে নয়, মুখ দিয়ে একটা অবঞ্ছিত কথা বলে ফেলল অথবা ঠাট্টা-মশকরার ছলে বা খেল-তামাশায় কোন অবাঞ্ছিত কথা উচ্চারণ করে ফেলল— এমন অপরাধীদেরও মুরতাদ্দ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তাদের এ কথাও বলা যেতে পারে, যে কথা তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন,

---

[26] মুরতাদ্দ হচ্ছে সেই মুসলিম, যে ইসলাম গ্রহণের পর কূফরীতে ফিরে যায়। [অনুবাদক]

﴿ يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدۡ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلۡكُفۡرِ وَكَفَرُواْ بَعۡدَ إِسۡلَٰمِهِمۡ ﴾ [التوبة: ٧٤]

অর্থাৎ— "তারা আল্লাহর নামে হলফ করে বলছে যে, তারা কিছুই বলে নি; অথচ কুফরী কথাই তারা নিশ্চয় বলেছে, ফলে ইসলামকে স্বীকার করার পর তারা কাফের হয়ে গিয়েছে।" (সূরা তাওবা :৭৪)

তুমি কি শোন নি, মাত্র একটি কথার জন্য আল্লাহ এক দল লোককে কাফের বলছেন, অথচ তারা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমসাময়িককালের লোক এবং তাঁর সঙ্গে জেহাদ করেছে, নামায পড়েছে, যাকাত দিয়েছে, হজ্ব পালন করেছে এবং তাওহীদের উপর বিশ্বাস রেখেছে?

অনুরূপভাবে ঐ সব লোক, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

﴿قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ ٦٥ لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡۚ ﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦]

"তুমি বল, তোমরা কি ঠাট্টা তামাশা করছিলে আল্লাহ ও তাঁর আয়াতগুলোর এবং তাঁর রাসূলের সম্বন্ধে? এখন আর কৈফিয়ত

পেশ করো না। তোমরা নিজেদের ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ।” (তাওবা: ৬৫-৬৬)

এ-সব লোকদের সম্বন্ধে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তারা ঈমান আনার পর কাফের হয়েছে। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তাবুকের যুদ্ধে যোগদান করেছিল, তারা তো মাত্র একটি কথাই বলেছিল এবং সেটাও হাসি-ঠাট্টার ছলে। অতএব তুমি এ সংশয় সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ, যাতে তারা বলে, তোমরা মুসলিমদের মধ্যে এমন লোককে কাফের বলছ যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তারা নামায পড়ছে, রোযা রাখছে। তারপর তাদের এ সংশয়ের জওয়াবও গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ। কেননা, এই পুস্তকের বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে এটাই অধিক উপকারজনক।

এই বিষয়ের আর একটা প্রমাণ হচ্ছে কুরআনে বর্ণিত সেই কাহিনী, যা আল্লাহ তা‘আলা বানী ইসরাঈলের সম্পর্কে বলেছেন। তাদের ইসলাম, তাদের জ্ঞান এবং সত্যাগ্রহ সত্বেও তারা মূসা ‘আলাইহি সালাম-কে বলেছিল :

﴿ٱجۡعَل لَّنَآ إِلَٰهٗا كَمَا لَهُمۡ ءَالِهَةٞۚ﴾ [الاعراف: ١٣٨]

আমাদের জন্যও একটা ইলাহ বানিয়ে দাও, যেমন তাদের রয়েছে অনেক ইলাহ। (সূরা আ'রাফ : ১৩৮)

অনুরূপভাবে সাহাবীগণের মধ্যে কেউ বলেছিলেন :

«اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ»

"আমাদের জন্য লটকানোর জায়গা প্রতিষ্ঠা করে দিন।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলফ করে বললেন, এটা তো বনী ইসরাইলদের মত কথা, যা তারা মূসা 'আলাইহিস সালাম-কে বলেছিল: আমাদের জন্যও একটা ইলাহ্ বানিয়ে দাও[27]।"

[27] তিরমিযী, হাদীস নং ২১৮০।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট শির্ক হতে যারা তওবা করে তাদের সম্বন্ধে হুকুম কি ?

[মুসলিমদের মধ্যে যখন কোনো এক প্রকারের শির্ক অজ্ঞাতসারে অনুপ্রবেশ করে ফেলে তারপর তারা তা হতে তওবা করে, তখন তাদের সম্বন্ধে হুকুম কি ?]

মুশরিকদের মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক হয়, যা তারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে বর্ণনা করে, আর তা হচ্ছে এই যে, তারা বলে, বনী ইসরাঈলেরা "আমাদের জন্য উপাস্য দেবতা বানিয়ে দিন" একথা বলে তারা কাফের হয়ে যায় নি। অনুরূপভাবে যারা বলেছিল, "আমাদের জন্য লটকানোর জায়গা প্রতিষ্ঠা করে দিন", তারাও কাফেরে পরিণত হয় নি।

এর জওয়াব হচ্ছে এই যে, বানী ইসরাঈলেরা যে প্রস্তাব পেশ করেছিল তা তারা কার্যে পরিণত করে নি, তেমনিভাবে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে 'যাতে আনওয়াত' (লটকানোর স্থান) প্রতিষ্ঠা করে দিতে বলেছিল তারাও তা করে

নি। বানী-ইসরাঈল যদি তা করে ফেলতো, তবে অবশ্যই তারা কাফের হয়ে যেতো। এ বিষয়ে কারো কোন ভিন্ন মত নেই।

একইরূপে এই বিষয়েও কোনো মতভেদ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম অমান্য করে—নিষেধ অগ্রাহ্য করে 'যাতে আনওয়াত' এর প্রতিষ্ঠা করত তাহলে তারাও কাফের হয়ে যেত, আর এটাই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য।

এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে যে, কোন মুসলিম বরং কোন 'আলেম কখনও কখনও শির্কের বিভিন্ন প্রকরণে লিপ্ত হয় কিন্তু সে তা উপলব্ধি করতে পারে না, ফলে এথেকে বাঁচার জন্য শিক্ষা ও সতর্কতার প্রয়োজন আছে। আর জাহেলরা[28] যে বলে— 'আমরা তাওহীদ বুঝি', এটা তাদের সবচেয়ে বড় মুর্খতা ও শয়তানের চক্রান্ত[29]।

---

[28] বর্তমানেও কোনো কোনো ইলমের দাবীদারকে তাওহীদ সম্পর্কে বলতে গেলে বলে যে আমারা তাওহীদের উপর আছি, তুমি কি আমাদেরকে তাওহীদ শিক্ষা দিচ্ছ? তোমার তাওহীদ নিয়ে তুমি থাক, ইত্যাদি। বাস্তবে তারা তাওহীদ নিয়ে কখনও চিন্তা গবেষণা করেনি। তারা অনেক জ্ঞানের অধিকারী হলেও তাওহীদ বুঝে না। নিঃসন্দেহে তারা অহংকারবশত আল্লাহর তাওহীদকে না জেনে কখনও কখনও শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। [সম্পাদক]

[29] কারণ তারা তাওহীদ না বুঝেও বুঝার দাবী করছে, ফলে শির্কে নিপতিত হচ্ছে। যদি তারা সত্যিকার তাওহীদ নিয়ে গবেষণা করত এবং তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করত, তবে কখনই শির্কে পতিত হতো না, কিন্তু শয়তান চায় না তারা তাওহীদ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে শির্কমুক্ত হয়ে যাক। [**সম্পাদক**]

আর এটাও জানা গেল যে, মুজতাহিদ মুসলিমও যখন না জেনে না বুঝে কুফরী কথা বলে ফেলে, তখন তার ভুল সম্বন্ধে অবহিত করা হলে সে যদি সেটা বুঝে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে তা হলে সে কাফের হবে না, যেমন বানী ইসরাঈল করেছিল এবং যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ‘যাতে আনওয়াত’ চেয়েছিল।

আর এর থেকে এটাও বুঝা যাচ্ছে যে, তারা কুফরী না করলেও তাদেরকে (তাদের পক্ষ থেকে কুফরী ও শির্ক চাওয়ার কারণে) কঠোর কথা বলতে হবে, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কলেমা মুখে উচ্চারণই যথেষ্ট নয়

[যারা মনে করে যে, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ মুখে বলাই তাওহীদের জন্য যথেষ্ট, বাস্তবে তার বিপরিত কিছু করলেও ক্ষতি নেই, তাদের উক্তি ও যুক্তির খণ্ডন]

মুশরিকদের মনে আর একটা সংশয় বদ্ধমূল হয়ে আছে, তা হল এই যে, তারা বলে থাকে, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ কলেমা পাঠ করা সত্ত্বেও উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকে হত্যা করেছিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই হত্যাকাণ্ডটাকে সমর্থন করেন নি। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসটিও তারা পেশ করে থাকে যেখানে তিনি বলেছেন, “আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে (মুখে উচ্চারণ করে) “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” তদ্রূপ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর উচ্চারণকারীদের হত্যা না করা সম্বন্ধে আরও অনেক হাদীস তারা তাদের মতের সমর্থনে পেশ করে থাকে।

এই মূর্খদের এসব প্রমাণ পেশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যারা মুখে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণ করবে, তারা যা ইচ্ছা তাই করুক, তাদেরকে কাফের বলা যাবে না, হত্যাও করা যাবে না। এ-সব জাহেল মুশরিকদের বলে দিতে হবে যে, একথা সর্বজনবিদিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাদেরকে কয়েদ করেছেন যদিও তারা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলত।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ বানু হানীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যদিও তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, ‘আল্লাহ ছাড়া নেই কোনো ইলাহ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল; তারা নামাযও পড়তো এবং ইসলামেরও দাবী করত। ঐ একই অবস্থা তাদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য যাদেরকে ‘আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া ঐ সব (বর্তমান কালে যারা শির্ক করে সে-সব) জাহেলরা স্বীকার করে যে, যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তারা কাফের হয়ে যায় এবং হত্যারও যোগ্য হয়ে যায়— তারা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা সত্বেও। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের রুকনসমূহের যে কোনো একটিকে অস্বীকার করে, সেও কাফের হয়ে যায় এবং সে হত্যার যোগ্য হয় যদিও সে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে”। তা হলে ইসলামের একটি শাখা অঙ্গ

অস্বীকার করার কারণে যদি তার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর উচ্চারণ তার কোনো উপকারে না আসে, তবে রাসূলগণের দ্বীনের মূল ভিত্তি যে তাওহীদ এবং যা হচ্ছে ইসলামের মূখ্য বস্তু, যে ব্যক্তি সেই তাওহীদকেই অস্বীকার করল তাকে ঐ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর উচ্চারণ কেমন করে বাঁচাতে সক্ষম হবে? কিন্তু আল্লাহর মুশমনরা হাদীসসমূহের তাৎপর্য বুঝে না।

ওসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তিনি একজন ইসলামের দাবীদারকে হত্যা করেছিলেন এই ধারণায় যে, সে তার জান ও মালের ভয়েই ইসলামের দাবী জানিয়েছিল।

কোনো মানুষ যখন ইসলামের দাবী করবে তার থেকে ইসলাম বিরোধী কোনো কাজ প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে। এ সম্বন্ধে কুরআনের ঘোষণা এই যে,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ [النساء: ٩٤]

“হে মুমিন সমাজ ! যখন তোমরা আল্লাহর রাহে বহির্গত হও, তখন (কাউকেও হত্যা করার পূর্বে) সব বিষয় তদন্ত করে দেখবে।” (সূরা নিসা : ৯৪) অর্থাৎ তার সম্বন্ধে তথ্যাদি নিয়ে দৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত হবে।

এই আয়াত পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এরূপ ব্যাপারে হত্যা থেকে বিরত থেকে তদন্তের পর স্থির নিশ্চিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তদন্তের পর যদি তার ইসলাম বিরোধী হওয়া সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় তবে তাকে হত্যা করা হবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, (ফাতাবাইয়ানু) অর্থাৎ 'তদন্ত করে দেখ'। তদন্ত করার পর দোষী সাব্যস্ত হলে হত্যা করতে হবে। যদি এই অবস্থাতে হত্যা না করা হয় তা হলে : 'ফাতাবাইয়ানু' অর্থাৎ স্থির নিশ্চিত হওয়ার কোনো অর্থ হয় না।

এভাবে অনুরূপ হাদীসগুলোর অর্থও বুঝে নিতে হবে। ঐগুলোর অর্থ হবে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ যে ব্যক্তির মধ্যে তাওহীদ ও ইসলাম প্রকাশ্যভাবে পাওয়া যাবে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকতে হবে— যে পর্যন্ত বিপরীত কোন কিছু প্রকাশিত না হবে।

এ কথার দলীল হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি কৈফিয়তের ভাষায় ওসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছিলেন, "তুমি তাকে হত্যা করেছ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও?" এবং তিনি আরও বলেছিলেন, "আমি লোকদেরকে হত্যা করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" সেই রাসূলই কিন্তু খারেজীদের সম্বন্ধে বলেছেন,

“যেখানেই তোমরা তাদের পাবে, হত্যা করবে, আমি যদি তাদের পেয়ে যাই তবে তাদেরকে হত্যা করব ‘আদ জাতির মত সার্বিক হত্যা।”[30] যদিও তারা (খারেজীরা) ছিল লোকদের মধ্যে অধিক ইবাদতগুযার, অধিক মাত্রায় ‘ল-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সুবহানাল্লাহ্’ উচ্চারণকালী।

তাছাড়া খারেজীরা এমন বিনয়-নম্রতার সঙ্গে নামায আদায় করত যে, সাহাবীগণ পর্যন্ত নিজেদের নামাযকে তাদের নামাজের তুলনায় তুচ্ছ মনে করতেন। তারা কিন্তু “ইল্‌ম শিক্ষা করেছিল সাহাবাগণের নিকট হতেই। কিন্তু কোনই উপকারে আসল না তাদের “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলা, তাদের অধিক পরিমাণ ইবাদত করা এবং তাদের ইসলামের দাবী করা, যখন তাদের থেকে শরীয়তের বিরোধী বিষয় প্রকাশিত হয়ে গেল।

ঐ একই পর্যায়ের বিষয় হচ্ছে ইয়াহূদীদের হত্যা এবং বানু হানীফার বিরুদ্ধে সাহাবীদের যুদ্ধ ও হত্যাকান্ড। ঐ একই কারণে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানী মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন যখন একজন লোক এসে খবর দিল যে, তারা যাকাত দিবে না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন,

---

[30] (বুখারী ও মুসলিম) অনুবাদক।

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ﴾ [الحجرات: ٦]

“হে মুমিন সমাজ! যখন কোনো ফাসেক ব্যক্তি কোনো গুরুতর সংবাদ নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করে, তখন তোমরা তার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখো।” (সূরা হুজুরাত : ৬) বস্তুত: উপরোক্ত সংবাদদাতা তাদের সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিল।

এইরূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সমস্ত হাদীসকে তারা দলীল-প্রমাণরূপে পেশ করে থাকে তার প্রত্যেকটির তাৎপর্য্য তা-ই যা আমরা উল্লেখ করেছি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

জীবিত ও মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য কামনার মধ্যে পার্থক্য

[উপস্থিত জীবিত ব্যক্তির নিকট তার আয়াত্তাধীন বিষয়ে সাহায্য কামনা এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট তার ক্ষমতার অতীত বিষয়ে সাহায্য কামনার মধ্যে পার্থক্য]

তাদের (মুশরিকদের) মনে আর একটি সন্দেহ বদ্ধ মূল হয়ে আছে আর তা হচ্ছে এই: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, লোক সকল কিয়ামত দিবসে তাদের (হয়রান পেরেশানীর অবস্থায়) প্রথম সাহায্য কামনা করবে আদম 'আলাইহিস সালাম এর নিকট, তারপর নূহ আলায়হিস সালাম এর নিকট, তারপর মূসা 'আলাইহিস সালাম এর নিকট। তারা প্রত্যেকেই তাদের অসুবিধার উল্লেখ করে 'ওযর পেশ করবেন, শেষ পর্যন্ত তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গমন করবেন।

তারা বলে, এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকটে সাহায্য চাওয়া শির্ক নয়।

আমাদের জওয়াব হচ্ছে : আল্লাহর কি মহিমা ! তিনি তাঁর শত্রুদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন।

সৃষ্ট জীবের নিকটে তার আয়ত্বাধীন বস্তুর সাহায্য চাওয়ার বৈধতা আমরা অস্বীকার করি না। যেমন আল্লাহ তা'আলা মুসা 'আলাইহিস সালাম এর ঘটনায় বলেছেন:

﴿فَٱسۡتَغَٰثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِي مِنۡ عَدُوِّهِۦ﴾ [القصص: ١٥]

"তখন তার সম্প্রদায়ের লোকটি তার শত্রুপক্ষীয় লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। (সূরা কাসাস : ১৫)

অনুরূপভাবে মানুষ তার সহচরদের নিকটে যুদ্ধে বা অন্য সময়ে ঐ বস্তুর সাহায্য চায় যা মানুষের আয়ত্বাধীন। কিন্ত আমরা তো ঐরূপ সাহায্য প্রার্থনা অস্বীকার করেছি যা ইবাদতস্বরূপ মুশরিকগণ করে থাকে ওলী-দের কবর বা মাযারে, অথবা তাদের অনুপস্থিতিতে এমন সব ব্যাপারে তাদের সাহায্য কামনা করে যা মঞ্জুর করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই।

যখন আমাদের এ বক্তব্য সাব্যস্ত হল, তখন নবীদের নিকটে কিয়ামতের দিন এ উদ্দেশ্যে সাহায্য চাওয়া যে, তারা আল্লাহর নিকটে এ প্রার্থনা জানাবেন যাতে তিনি জান্নাতবাসীর হিসাব

(সহজ ও শীর্ঘ) সম্পন্ন ক'রে হাশরের ময়দানে অবস্থানের কষ্ট হতে আরাম দান করেন, এ ধরনের প্রার্থনা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই সিদ্ধ। যেমন জীবিত কোনো নেক লোকের নিকটে তুমি গমন কর, সে তোমাকে তার নিকটে বসায় এবং কথা শুনে। তাকে তুমি বল : আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকটে দো'আ করুন। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ তাঁর জীবিতকালে তাঁর নিকট অনুরোধ জানাতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কবরের নিকট গিয়ে এ ধরনের অনুরোধ কক্ষনো তারা জানান নি। বরং সালাফুস সালেহ বা পূর্ববর্তী মনীষিগণ তাঁর কবরের নিকট গিয়ে আল্লাহকে ডাকতে (এবং সেটাকে অবাঞ্ছিত কাজ মনে করে তাতে সম্মতি দিতে) অস্বীকার করেছেন। অবস্থার এই পেক্ষিতে কি করে স্বয়ং তাঁকেই ডাকা যেতে পারে ?

তাদের মনে আর একটা সংশয় রয়েছে ইব্‌রাহীম আলায়হিস সালাম এর ঘটনায়। যখন তিনি অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হন তখন শুন্যলোক হতে জিব্রীল 'আলাইহিস সালাম তাঁর নিকট আরয করলেন, আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে? তখন ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস সালাম বললেন, যদি বলেন, আপনার নিকটে, তবে আমার কোনই প্রয়োজন নেই।

তারা (মুশরিকরা) বলে: জিব্রীলের নিকট সাহায্য কামানা করা যদি শির্ক হতে তাহলে তিনি কিছুতেই ইব্‌রাহীম ‘আলাইহিস সালাম এর নিকট উক্ত প্রস্তাব পেশ করতেন না। এর জওয়াব হচ্ছে : এটা প্রথম শ্রেণির সন্দেহের পর্যায়ভুক্ত। কেননা জিব্রীল ‘আলাইহিস সালাম তাঁকে এমন এক ব্যাপারে উপকৃত করতে চেয়েছিলেন যা করার মত ক্ষমতা ছিল তার আয়ত্ত্বাধীন। আল্লাহ স্বয়ং তাঁকে ‘শাদীদুল কুওয়া’ অর্থাৎ অত্যন্ত শক্তিশালী বলে উল্লেখ করেছেন। ইব্‌রাহীম ‘আলাইহিস সালাম এর জন্য প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ড এবং তার চারদিকের জমি ও পাহাড় যা কিছু ছিল সেগুলো ধরে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে নিক্ষেপ করতে যদি আল্লাহ অনুমতি দিতেন তা হলে তিনি তা অবশ্য করতে পারতেন। যদি আল্লাহ ইব্‌রাহীম আলায়হিস সালামকে দুশমনদের নিকট থেকে দূরবর্তী কোথাও স্থানান্তরিত করতে আদেশ দিতেন, তাও তিনি অবশ্যই করতে পারতেন, আর আল্লাহ যদি তাকে আকাশে তুলতে বলতেন, তাও তিনি করতে সক্ষম হতেন।

তাদের সংশয়ের বিষয়টি তুলনীয় এমন একজন বিত্তশালী লোকের সঙ্গে যার প্রচুর ধন দৌলত রয়েছে। সে একজন অভাবগ্রস্ত লোক দেখে তার অভাব মিটানোর জন্য তাকে কিছু অর্থ ঋণস্বরূপ দেওয়ার প্রস্তাব করল অথবা তাকে কিছু টাকা অনুদানস্বরূপ দিয়েই দিল। কিন্তু সেই অভাবগ্রস্ত লোকটি তা গ্রহণ

করতে অস্বীকার করল এবং কারোর কোনো অনুগ্রহের তোয়াক্কা না করে আল্লাহর রেযেক না পৌঁছা পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করল। তা হলে এটা বান্দার নিকট সাহায্য কামনা এবং শির্ক কেমন করে হ'ল? আহা যদি তারা বুঝত !

ষোড়শ অধ্যায়

অন্তরে, কথায় ও কর্মে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা; যদি না শর্‌য়ী ওযর থাকে

আমি এবার ইনশাআল্লাহু তা'আলা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করে আমার বক্তব্যের উপসংহার টানব। পূর্ব আলোচনাসমূহে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত হয়েছে বটে কিন্তু তার বিশেষ গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং তৎসম্পর্কে অধিক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হওয়ার ফলে আমি উক্ত বিষয়ে এখানে পৃথকভাবে কিছু আলোচনার প্রয়াস পাব।

এ বিষয়ে কোনই দ্বিমত নেই যে, তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি হতে হবে অন্তর দ্বারা, জিহ্বা দ্বারা এবং কর্মে তার বাস্তবায়ন দ্বারা। এর থেকে যদি কোনো ব্যক্তির কিছুমাত্র বিচ্যুতি ঘটে, তবে সে মুসলিম বলে বিবেচিত হবে না।

যদি কোনো ব্যক্তি তাওহীদ কী— তা হৃদয়ঙ্গম করে কিন্তু তার উপর 'আমল না করে, তবে সে হবে হঠকারী কাফের, তার তুলনা হবে ফির'আউন, ইবলীস প্রভৃতির সঙ্গে। এখানেই অধিক সংখ্যক লোক বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়। তারা বলে থাকে, এটা

সত্য, আমরা এটা বুঝেছি এবং তার সত্যতার সাক্ষ্যও দিচ্ছি। কিন্তু আমরা তা কার্যে পরিণত করতে সক্ষম নই। আর আমাদের দেশবাসীদের নিকট তা সিদ্ধ নয়- কিন্তু যারা তাদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণকারী (তারা ছাড়া)। এই সব ওযুহাত এবং অন্যান্য ওযর আপত্তি তারা পেশ করে থাকে।

আর এই হতভাগারা বুঝে না যে, অধিকাংশ কাফের নেতা সত্য জানত কিন্তু জেনেও তা প্রত্যাখ্যান করত শুধু কতিপয় 'ওযর আপত্তির জন্য। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

﴿ٱشۡتَرَوۡاْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنٗا قَلِيلٗا﴾ [التوبة: ٩]

"আল্লাহর আয়াতগুলিকে তারা বিক্রয় করে ফেলেছে নগণ্য মূলের বিনিময়ে।" (আত-তাওবা : ৯০)। অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে :

﴿ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمۡۖ ﴾ [البقرة: ١٤٦]

"তারা তাঁকে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বা হককে) ঠিক সেই ভাবেই চিনে যেমন তারা চিনে তাদের পুত্রদিগকে।" (বাকারা : ১৪৬)

আর কেউ যদি তাওহীদ না বুঝে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তার উপর আমল করে, অথবা সে যদি অন্তরে বিশ্বাস না রেখে আমল করে তবে তো সে মুনাফিক; সে নিরেট কাফের থেকেও মন্দ। স্বয়ং আল্লাহ মুনাফিকদের পরিণতি সম্বন্ধে বলেছেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥]

'নিশ্চয় মুনাফিকগণ অবস্থান করবে জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে।' (সূরা আন নিসা: ১৪৫)

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর, অতীব দীর্ঘ ও ব্যাপক, তোমার নিকটে এটা প্রকাশ হবে যখন জনসাধারণের আলোচনার উপর গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে দেখবে, তখন তুমি দেখবে সত্যকে জেনে বুঝেও তারা তার উপরে আমল করে না এই আশঙ্কায় যে, তাদের পার্থিব ক্ষতি হবে অথবা কারও সম্মানের হানি হবে কিংবা সম্পর্কের ক্ষতি হবে।

তুমি আরও দেখতে পাবে যে, কতক লোক প্রকাশ্যভাবে কোন কাজ করছে কিন্তু তাদের অন্তরে তা নেই। তাকে তার অন্তরের প্রত্যয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে দেখবে যে, সে তাওহীদ কি তা বুঝে না।

অবস্থার এই প্রেক্ষিতে মাত্র দু'টি আয়াতের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা তোমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। প্রথমটি হচ্ছে :

﴿ لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡۚ ﴾ [التوبة: ٦٦]

"এখন তোমরা আর কৈফিয়ত পেশ করো না, ঈমান আনয়নের পরও তো তোমরা কুফরী কাজে লিপ্ত রয়েছ।" (সূরা তাওবা : ৬৬)

যখন এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, কতিপয় সাহাবী যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে রোমানদের বিরুদ্ধে (তাবুকের) যুদ্ধে গমন করেছিল তারা ঠাট্টাচ্ছলে কোনো একটি কথা বলার ফলে কাফের হয়ে গিয়েছিল; তখন তোমার কাছে সুস্পষ্ট হবে যে, হাসি ঠাট্টার সঙ্গে কোনো কথা বলার চেয়ে অধিক গুরুতর সেই ব্যক্তির অবস্থা, যে কুফরী কথা বলে অথবা কুফরী 'আমল করে ধনদৌলতের ক্ষতির আশঙ্কায় কিংবা সম্মানহানি অথবা সম্পর্কের ক্ষতির ভয়ে।

দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে :

﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝١٠٦ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْءَاخِرَةِ ﴾
[النحل: ١٠٦، ١٠٧]

“কেউ তার ঈমান স্থাপনের পর আল্লাহর সাথে কুফরী করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য আছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয় যাকে সত্য প্রত্যাখ্যানে বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত বিশ্বাসে অবিচলিত। এটা এই জন্য যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়।” (সূরা নাহ্ল : ১০৬-১০৭)

আল্লাহ এদের কারোরই ‘ওযর আপত্তি কবুল করেন নি; তবে কবূল করেছেন শুধু তাদের ‘ওযর যাদের অন্তর ঈমানের উপরে স্থির ও প্রশান্ত রয়েছে, কিন্তু তাদেরকে জবরদস্তি করে বাধ্য করা হয়েছে। এরা ব্যতীত উপরোল্লিখিত ব্যক্তিরা তাদের ঈমানের পর কুফরী করেছে। চাই তারা ভয়েই তা করে থাকুক অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় তা হোক কিংবা গোত্র অথবা ধন-দৌলতের প্রতি আকর্ষণের জন্যই হোক অথবা হাসি-ঠাট্টার ছলেই কুফরী কালাম উচ্চারণ করুক অথবা এ ছাড়া অন্য যে কোনো উদ্দেশ্য হাসেলের জন্য তা করে থাকুক— শুধু বাধ্য হওয়া ব্যতীত। সুতরাং বর্ণিত আয়াতটি এই অর্থই বুঝিয়ে থাকে দু’টি দৃষ্টিকোণ থেকে—

প্রথমত: আল্লাহর বাণীতে বলা হয়েছে : ﴿إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ﴾ “কিন্তু যদি তাকে বাধ্য করা হয়ে থাকে”, আল্লাহ বাধ্যকৃত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যতিক্রমের সুযোগ রাখেন নি। **একথা সুবিদিত যে**, মানুষকে একমাত্র কথা অথবা কাজেই বাধ্য করা যায়। কিন্তু অন্তরের প্রত্যয়ে কাউকে বাধ্য করা চলে না।

দ্বিতীয় : আল্লাহর এই বাণী :

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا عَلَى ٱلۡأٓخِرَةِ﴾ [النحل: ١٠٧]

“এটি এই জন্য যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়।” (নাহ্‌ল: ১০৭)

এ আয়াতটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই কুফরী ও তার শাস্তি তাদের বিশ্বাস, মূর্খতা, দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ বা কুফরীর প্রতি অনুরাগের কারণে নয়, বরং এর কারণ হচ্ছে দুনিয়া থেকে কিছু অংশ হাসিল করা, যে জন্য সে দুনিয়াকে দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিয়েছে।

পাক-পবিত্র ও মহান আল্লাহই এ সম্পর্কে অধিক অবহিত রয়েছেন। আর আল্লাহ তা‘আলা সালাত পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর

পরিবার ও সহচরবর্গের উপর, আর তাঁদের সকলের উপর শান্তি অবতীর্ণ করুন। (আমীন!)

—সমাপ্ত—

বিষয়সূচি

আমাদের যুগের লোকদের শির্ক ছিল অপেক্ষাকৃত হালকা

ফরয-ওয়াজেব হয় না— এই ভ্রান্তধারণার নিরসন

মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট শির্ক হতে যারা তওবা করে তাদের সম্বন্ধে হুকুম কি ?

‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু কলেমা মুখে উচ্চারণই যথেষ্টে নয়

জীবিত ও মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য কামনার মধ্যে পার্থক্য

শর’য়ী ‘ওযর ছাড়া কায়মনোবাক্যে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা